নক্ষত্রকথা

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম পর্ব	৪-১২
দ্বিতীয় পর্ব	১৩-২৩
তৃতীয় পর্ব	২৪-৩৩
চতুর্থ পর্ব	৩৪-৪৪
পঞ্চম পর্ব	৪৫-৫১
ষষ্ঠ পর্ব	৫২-৬৫

॥নক্ষত্র কথা॥

আমার সীমিত জ্ঞানে নক্ষত্র নিয়ে একেবারেই অনুচিত আলোচনা করা কিন্ত বিশিষ্ট সদস্যা জবা ঘোষ দিদির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে ভাবলাম দেখি না চেষ্টা করে। যদি কোথাও কিছু ভুল হয়, আমাকে জানাবেন অবশ্যই, সবাইকে অনুরোধ সেটা কারণ এটা একেবারেই পড়ে পড়ে লেখা গোছের ঘটনা, আগেই নিজের অজ্ঞানতাজনিত কারণে ক্ষমা চেয়ে রাখছি পরিবারের সবার কাছে। জ্যোতিষে আমার আগ্রহ সেই ছোটবেলা থেকে, তাই কিছু জ্যোতিষের বই সংগ্রহে আছে, অবসরে নাড়াচাড়াও করি সেসব। তাছাড়া বাড়িতে চারজন জ্যোতিষীর সান্নিধ্য পেয়েছি, আমার শ্বশুরমশাই, আমার ভাসুর, আমার মাসতুতো দেওর যে এখন নর্মদা পরিক্রমারত এবং আমার স্বামী, তাই সে আগ্রহ আরো বেড়েছে, যদিও এঁরা কেউই জ্যোতিষকে বৃত্তি হিসেবে নেননি কিন্তু সুগভীর জ্ঞান আছে, তাই এঁদের সান্নিধ্যে আমিও একটু আলোকিত হয়েছি আর অকাল্ট সায়েন্স আমাকে বরাবর টানে, এরপরে জ্যোতির্মন্ডলীর ওপরে বেশ কিছু লেখা পড়ে লিখতে চেষ্টা করেছি মোট পাঁচটি পর্বে নক্ষত্র কথা। কিছু কিছু জায়গায় পুনরাবৃত্তি আছে, সেগুলো প্রাসঙ্গিকতা রেখেই আছে।

প্রথম পর্ব

******

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আর্যদের জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে নক্ষত্র হল চন্দ্রপথের ২৮টি ভাগ যেগুলো “চন্দ্রনিবাস” হিসেবে পরিচিত। সূর্যের গতিপথকে যেমন ১২ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগের নাম রাখা হয়েছে রাশি, তেমনি চন্দ্রপথকে ২৮ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগের নাম রাখা হয়েছে নক্ষত্র। বিভিন্ন দেশে এই চন্দ্রনিবাসসমূহের নাম বিভিন্ন। ভূমধ্যাঞ্চলীয় আরবে ও পূর্বাঞ্চলীয় চীনে সময় পরিমাপের এ প্রাকৃতিক ঘড়িটিকে ২৮ ভাগেই ভাগ ক'রে নিয়েছে। আরবরা একে বলে “মঞ্জিল” আর চীনাদের কাছে এ “সিউ” নামে পরিচিত। মিশরেও এমন এক আকাশবিভাজন পাওয়া যায়, যা ৩৬ ভাগে বিভক্ত “দেকান” নামে পরিচিত। প্রাচীন গ্রিসে এধরনের কোন চন্দ্রনিবাস চর্চার কথা জানা যায় না। গণিতজ্যোতিষে গাণিতিকভাবে ১২.৮৫৩ (বা ১২° ৫১ ৩/৭') অংশে (degree) এক নক্ষত্র ও ২.৩ নক্ষত্রে এক রাশি হিসেব করা হয়।

সময়ের হিসেব রাখার প্রয়োজনে নিশাসঙ্গী চাঁদের গতিপথকে মানুষ বুঝতে চেয়ে আসছে কত আগে থেকে তা এখনও অজানা। সম্প্রতি স্কটল্যান্ডের আবডীনশায়ারে অন্তত ১০,০০০ বছরের প্রাচীন এক চন্দ্রনিবাসের সন্ধান পেয়েছে একদল প্রত্নতাত্ত্বিক যা প্রচলিত চন্দ্রনিবাসগুলোর প্রাচীনতমটির থেকেও ৫,০০০ বছর আগের।

ঋগ্বেদীয়দেবদেবী ইন্দ্র,অগ্নি, সোম, বিশ্বদেব,অশ্বিনীদ্বয়, মরুৎগণ, বরুণ প্রমুখ দেবতা সূক্ত-দ্রষ্টা ঋষিদের মননে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠা, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, উত্তরাষাঢ়া, অশ্বিণী, শতভিষা, স্বাতী প্রভৃতি। সর্বপ্রাচীন যে গ্রন্থে ২৮ নক্ষত্রের তালিকা পাওয়া তার নাম যজুর্বেদ ৪.৪.১০। এছাড়া অথর্ববেদ ১৯.৭ ও লগধের বেদাঙ্গ জ্যোতিষেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেটি খ্রী.পূ. ১২শ শতাব্দীর রচিত হয়। সে সময়কালটি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত পরবর্তী হরপ্পা যুগকে নির্দেশ করে। যদিও জ্যোতিষীয় চর্চায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত

অভিজিৎ নক্ষত্রকে ধারণ করতে পারেনি, কারণ চন্দ্রনিবাস হিসেবে অভিজিতের বিস্তৃতি অন্য নক্ষত্রদের থেকে কম।

প্রাগেতিহাসিক কাল থেকে সময়ের হিসেব রাখার প্রয়োজনেই চাঁদ-পৃথিবী-সূর্য-তারামন্ডল দিয়ে পরমকরুণাময় সৃজক-নির্মিত বিশাল পরিসরের এ প্রাকৃতিক ঘড়িটিকে মানুষ ব্যবহার ক'রে আসছে। চাঁদ প্রত্যেক তিথিতে একেকটি নক্ষত্রের সীমানায় অবস্থান করে। পূর্ণিমার দিন চাঁদ যে নক্ষত্রে অবস্থান করে তদনুসারে মাসের নাম বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি রাখা হয়েছে। প্রত্যেক নক্ষত্রের আকাশস্থানের পরিমাণ (৩৬০ / ২৮= ১২ ডিগ্রী ৮৬ মিনিট)। প্রতিটি নক্ষত্রের একটি বিশেষ তারাকে (সাধারণত উজ্জ্বলতম তারাকে) নির্দিষ্ট করা হয় এবং একে যোগতারা বলা হয়। কোন নক্ষত্রের আদিবিন্দু থেকে ঐ নক্ষত্রের যোগতারা পর্যন্ত ভূকক্ষের অংশকে উক্ত নক্ষত্রের ভোগ বলা হয়। শাস্ত্রে নক্ষত্রের অবস্থান এবং যোগতারা নির্দিষ্ট করা আছে। তাই প্রত্যেক নক্ষত্রের ভোগ নির্দিষ্ট। এর কোন পরিবর্তন হয়না।

নক্ষত্র চেনা

****

আকাশে চোখে যে ছয় হাজার আন্দাজ নক্ষত্র দেখা যায়, জ্যোতিষীরা তাদের সকলেরি হিসাব রাখেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকেরই এক-একটা নাম দিয়ে তা বইতে ও নক্ষত্রদের ম্যাপে লিখে রাখেন।

অনেকেই ভাবছেন, গোটা পঁচিশ নাম আমাদের মনে রাখা যখন কঠিন, ছয় হাজার নক্ষত্রের নাম মনে রাখবার জন্য বুঝি জ্যোতিষীরা রাত্রি জেগে নাম মুখস্থ করেন। কিন্তু তা করতে হয় না।

পৃথিবীতে কত গ্রাম ও নগর আছে ভেবে দেখুন। গ্রামের কথা ছেড়ে যদি বড় বড় সহরগুলির একটা হিসাব করা যায়, তা হলে সহরের সংখ্যা ছয় হাজারের বেশি হয় না কি? কিন্তু এদের নাম আমরা মনে রাখতে চেষ্টা করি না। আমরা পৃথিবীকে কখনই একটিমাত্র দেশ বলে মনে করি না, সমস্ত স্থলভাগকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করি এবং এক-একটা ভাগের এক-একটা নাম দিই। তার পর বইতে ও ম্যাপে তাদের নাম লিখি। এই সব নাম আমাদের প্রায়ই মনে থাকে। মনে না থাকলে ম্যাপ দেখে বই খুলে কোথায় কোন্ সহর আছে ঠিক্ করি।

নক্ষত্র চিনবার জন্য জ্যোতিষীরা ঠিক ঐরকমই করেন। তাঁরা সমস্ত আকাশটাকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করেন এবং এক-একটা ভাগকে এক-একটা নক্ষত্রমণ্ডল বা রাশি বলেন। তার পরে প্রত্যেক ভাগের কোথায় কোন্ নক্ষত্রটি আছে, আকাশের ম্যাপে লিখে রাখেন এবং বড় বড় নক্ষত্রদের এক-একটা নামও দেন। কেউ নক্ষত্র চিনিতে গেলে, তাঁরা আকাশে সেই নক্ষত্র-মণ্ডলগুলিকে দেখান এবং তাদের মধ্যে যে-সব নক্ষত্র আছে তাদের নাম শিখিয়ে দেন।

পৃথিবীকে কি রকমে ভাগ করা হয়, আমরা ভূগোলে তা পড়েছি। এক এক রাজা যে জায়গাটুকুতে রাজত্ব করেন, সেই জায়গাগুলিকে প্রায়ই এক একটা দেশ বলা হয়। যেমন এ অঞ্চলে ইংরাজ যেটুকুতে রাজত্ব করে গেছেন একদা, তা ভারতবর্ষ; কাবুলের আমীর যে অংশের রাজা তা আফগানিস্তান্; মিকাডো যেটুকু শাসন করেন, তা

জাপান। কিন্তু আকাশে ত আর এ-রকম রাজা নাই এবং রাজ্যও নাই; কাজেই জ্যোতিষীরা আর এক রকমভাবে আকাশকে ভাগ করেছেন।

ছোটবেলায় গ্রীষ্মের রাত্রে আকাশের দিকে তাকালে মনে হত কত ছোট ছোট ফুটকি গোটা আকাশ জুড়ে। যদি নক্ষত্রগুলিকে আমরা যদি কিছুক্ষণ ভাল করে দেখতে থাকি, তা হলে দেখা যাবে, এক জায়গার কতকগুলি নক্ষত্র মিলে যেন একগাছি মালার মত হয়ে রয়েছে । আর এক জায়গায় হয় ত দেখা যাবে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মিলে যেন বেশ একটা তিন কোণা বা চার কোণা জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে । শরৎকালে যখন সাদা মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়, তখন মেঘে কত রকম আকৃতি কল্পনা করা যায়, তাই না? একটা মেঘকে হয় ত ঠিক্ হাতীর মত দেখা গেল, কিছুক্ষণ পরে তা একটা গোরু বা বুড়ো মানুষের মত হয়ে দাঁড়াল। এ-রকম মেঘের খেলা অনেক সময়েই দেখা যায়। জ্যোতিষীরা আকাশের নক্ষত্রদের নিয়ে ঐ রকমই এক-একটা অদ্ভুত আকৃতির কল্পনা করে থাকেন।

তা হলে বোঝা যাচ্ছে, আকাশে রাজা বা রাজ্য না থাকলেও, তার জায়গায় জায়গায় নক্ষত্রেরা মিলে যে-সব আকৃতির সৃষ্টি করেছে তা আছে। জ্যোতিষীরা এই সব আকৃতিকে মনে রেখে আকাশকে নানা অংশে ভাগ করেন এবং কতকগুলি নক্ষত্র একত্র হয়ে আকাশের যেখানে একটা ভেড়ার মত চেহারা পেয়েছে , তাকে মেষরাশি বলেন; যেখানে ষাঁড়ের মত চেহারা পেয়েছে তাকে বৃষরাশি বলেন এবং যেখানে বিছার মত আকৃতি হয়েছে তাকে বৃশ্চিকরাশি বলেন। এই রকম রাশিতে এবং নক্ষত্র-মণ্ডলে সমস্ত আকাশ ভাগ করা রয়েছে। কেবল তাই নয়, কোন্ কোন্ নক্ষত্র মিলে আকাশের কোন্ অংশে মেষ, বৃষ, বিছা প্রভৃতির মত হয়ে আছে, জ্যোতিষীরা তাও ম্যাপে এঁকে রাখেন। যারা নক্ষত্র চিনতে চায়, তাদেরকে সেই ম্যাপ দেখিয়ে আকাশের কোথায় মেষরাশি, কোথায় বৃষরাশি আছে, তা দেখিয়ে দেন।

তা হলে বোঝা যাচ্ছে নক্ষত্র চেনা খুব শক্ত নয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করল, জাপানের টোকিয়ো সহর কোথায়? যার ভূগোল জানা আছে, সে কানাডা বেল্‌জিয়ম্ ইংলণ্ড বা চীন দেশে খোঁজ না করে, প্রথমেই জাপান দেশটিকে ম্যাপে দেখে এবং শেষে টোকিয়ো সহরকে আঙুল দিয়ে দেখায়। সেই রকম যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বৃষরাশির রোহিণী নক্ষত্র কোথায়,—তা হলে যার নক্ষত্র চেনা আছে, সে কোনো দিকে না তাকিয়ে আকাশের যেখানে বৃষরাশি আছে, তার খোঁজ করে এবং তার পরে সেখানে রোহিণী নক্ষত্রকে ধরে ফেলে।

পৃথিবীতে রাজার সংখ্যা খুব বেশি নয়, কাজেই রাজ্যের সংখ্যাও বেশি নয়। কিন্তু জ্যোতিষীরা আকাশকে যে-সব মণ্ডল বা রাশিতে ভাগ করেছেন, তার সংখ্যা অনেক। ক্যাল্‌ডিয়ান্ নামে এক অতি প্রাচীন জাতি নক্ষত্রদের নিয়ে সর্ব্বপ্রথমে নানা আকৃতির কল্পনা করতেন। মেষপালন এঁদের কাজ ছিল। তাঁরা এখনকার লোকদের মত লেখাপড়া জানতেন না এবং গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধির কথাও বুঝতেন না। বাঘ-ভাল্লুকের মুখ হতে ভেড়াগুলোকে রক্ষা করবার জন্য তাঁরা খোলা মাঠের মধ্যে শুয়ে রাত জেগে পাহারা দিতেন এবং নক্ষত্রদের দেখে তাদের এক-একটা আকৃতি কল্পনা করতেন। এই রকমে তাঁরা সিংহ ভাল্লুক ছাগল কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুর নামে আকাশকে অনেক ভাগে ভাগ করে ফেলেছিলেন। আজকালকার জ্যোতিষীরা সেই ক্যাল্‌ডিয়ান্‌দেরই ভাগকে মেনে চলছেন। আমরা আকাশের সকল নক্ষত্র-মণ্ডলের কথা বলব না, কেবল প্রধান প্রধান গোটাকতককে চিনবার উপায় বলে দেব।

উত্তর-আকাশের সপ্তর্ষি নামে নক্ষত্র মণ্ডল আসলে কি? সাতটি বড় বড় নক্ষত্রকে নিয়ে এই মণ্ডলটি হয়েছে। এখানে নিচে সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটা ছবি দিলাম। এর সাতটি নক্ষত্র কেমন সুন্দরভাবে সাজান আছে দেখা যাক। যখন উত্তর-আকাশে সপ্তর্ষির উদয় হয়, তখন নক্ষত্রগুলিকে ঐ রকমেই সাজানো দেখা যায়।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার সময়ে আমরা এই মণ্ডলকে উত্তর আকাশের খুব উপর দিকে দেখতে পাই এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস থেকে তাকে এক-একটু করে পশ্চিমে হেলতে দেখি। তার পরে ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ এই চার মাসের সন্ধ্যাকালে যদি আমরা সপ্তর্ষির খোঁজ করি, তা হলে তাকে দেখতেই পাব না। পৌষ মাসে খোঁজ করলে সন্ধ্যার সময় আকাশের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ থেকে একে একটু -একটু করে উপরে উঠতে দেখা যাবে। আসলে পৃথিবীর ঋতুচক্রের ঘুর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রদেরও অবস্থান পাল্টাতে থাকে।

যে ছবি দেওয়া গেল তার সঙ্গে মিলিয়ে হয়ত সপ্তর্ষিকে চিনতে পারা যাবে। যদি চিনতে না পারা যায়, তবে যাঁরা একটু-আধটু জ্যোতিষের কথা জানেন তাঁদের কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিলে, তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলকে চিনিয়ে দেবেন। দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসর আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সপ্তর্ষিকে বেশ ভাল করে জানতেন এবং এর সাতটি নক্ষত্রের মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, এবং বশিষ্ঠ এই সাতটি নাম দিয়েছিলেন। এগুলি আমাদের দেশের বড় বড় ঋষিদের নাম। এই জন্যই এই সাতটি তারা আকাশের যে জায়গাতে আছে, তাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলা হয়।

সপ্তর্ষিমন্ডল ইংরেজি Ursa Major বা Great Bear। দ্বিতীয় শতকের জ্যোতির্বিদ টলেমি কর্তৃক প্রণীত ৪৮টি তারামণ্ডলের একটি। আধুনিক কালে বর্ণিত ৮৮টি তারামণ্ডলের তালিকায়ও এটি তৃতীয় বৃহত্তম। এটি সাতটি তারার সমন্বয়ে গঠিত নক্ষত্রমণ্ডল। উত্তরগোলার্ধ থেকে সারা বছরই এই তারামণ্ডলকে দেখা যায়। উপমহাদেশের জ্যোতির্বিদগণ সাত জন ঋষির নামে এই সাতটি তারার নামকরণ করেন তাই এই নক্ষত্রমণ্ডলটি সপ্তর্ষিমন্ডল নামে পরিচিত হয়।

সপ্তর্ষিমণ্ডল সারা বছর ধ্রুবতারার চারদিকে ঘোরে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রথম দু'টি তারা ক্রতু ও পুলহ-কে যোগ করে সরলরেখা কল্পনা করলে ওই সরলরেখা ধ্রুবতারার দিকে নির্দেশ করে, এবং রেখাটিকে বিপরীতে চালিত করলে সিংহ রাশিতে নির্দেশ করে।

এতে বশিষ্ঠএর পাশে ছোটো একটি তারা দেখা যায়, নাম অরুন্ধতী। অরুন্ধতী ছিলেন ঋষি বশিষ্ঠের স্ত্রী। ইংরেজ-জ্যোতিষীরাও সপ্তর্ষির সাতটি তারার এক-একটি নাম রেখেছেন; কিন্তু সেগুলি দেবতা বা ঋষিদের নাম নয়। তাঁরা একে সপ্তর্ষিমণ্ডল না বলে ভাল্লুক-মণ্ডল বলেছেন। সাতটি নক্ষত্রে মিলে একটি ভাল্লুকের আকৃতি করেছে বলে তাঁদের মনে হয়েছিল। শেষের তিনটি তারাকে তাঁহারা ভাল্লুকের লেজ বলেন।

এ মণ্ডলীর ইংরেজি নাম Ursa major বা দি গ্রেট বিয়ার (the Great Bear)-এর অর্থ বৃহৎ ভালুক। গ্রিকরা অনেকগুলি তারা নিয়ে তৈরি বৃহদাকার ভালুক এর মতো নক্ষত্রমণ্ডলকে Ursa Major বলে শনাক্ত করেছিলেন যেখানে ভারতীয় নক্ষত্রমন্ডলটির সবচেয়ে উজ্জ্বল সাতটি তারাই পর্যবেক্ষণ করেন যেগুলি প্রশ্নবোধক চিহ্নের

আকৃতিতে অবস্থান করে, তাই এমন নাম দেন। পাশ্চাত্যের মানুষও এই সাতটি তারা পর্যবেক্ষণ করেন এবং নাম দেন The Big Dipper, তবে তারা এটিকে তারামন্ডল বলে গণনা না করে তারামন্ডলের মধ্যে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র তারাগুচ্ছ বা asterism বলেই গণ্য করেন।

সপ্তর্ষির একটি তারা বড় মজার। একে আমাদের জ্যোতিষীরা বশিষ্ঠ বলেন। পরিষ্কার রাত্রিতে যদি বশিষ্ঠকে ভাল করিয়া দেখি, তা হলে এর ঠিক গায়ে একটি খুব ছোট নক্ষত্র দেখতে পাব। এটির নাম "অরুন্ধতী।" অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী। সকলের ভাগ্যে কিন্তু ঐ ছোট নক্ষত্রটিকে দেখা ঘটে না। যাদের দৃষ্টিশক্তি খুব ভাল তারাই অরুন্ধতীকে দেখতে পায়। একটু চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে ।

সপ্ত ঋষির নাম আগেই বলেছি। না মনে থাকলে সেগুলো নিচে দিলাম-
১. অত্রি
২. বশিষ্ঠ
৩. কশ্যপ (তাঁর থেকেই কাশ্মীরের নামকরণ)
৪. গৌতম
৫. ভরদ্বাজ
৬. বিশ্বামিত্র (রাজর্ষি থেকে ব্রহ্মর্ষি)
৭. অঙ্গিরা

এই সাতজন ঋষির সম্মানেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ একটি নক্ষত্রমণ্ডলের নামকরণ করেন। তবে শাস্ত্র ও যুগভেদে ঋষিদের নাম পরিবর্তিত হতে পারে। আরো মজার কথা এই সাত ঋষিদেরই সন্তান আমরা কারণ এঁরাই গোত্র প্রধান।

আমরা ধ্রুব-তারার বোধ হয় নাম শুনেছি। সব তারা রাত্রিতে সরতে সরতে পশ্চিমে অস্ত যায়, কিন্তু ধ্রুব তারার অস্ত নাই,—উদয়ও নাই। আজ তাকে যেখানে দেখছি, এক শত বৎসর পরে, হয় ত হাজার বৎসরও পরে তাকে ঠিক সেই জায়গাতেই দেখা যাবে। সপ্তর্ষি দিয়ে এই তারাটিকে বেশ চেনা যায়। ধ্রুবতারার পিছনে একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে।

'ধ্রুব' অর্থাৎ স্থির বা অটল। রাতের আকাশে উত্তর দিকে বহু নক্ষত্রের মাঝে স্বমহিমায় জ্বলজ্বল করছে একটি নক্ষত্র। এটিই ধ্রুবতারা।

মহাভারতে, ও বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে, মনুর (ব্রহ্মার আধ্যাত্মিক পুত্র) সন্তান ছিলেন রাজা উত্তানপাদ। আর রাজা উত্তানপাদ ও রানী সুনীতির একমাত্র সন্তান ছিলেন ধ্রুব। রাজার অপর রানী, সুরুচির একমাত্র সন্তান ছিলেন উত্তম।

রানী সুরুচি ছিলেন রাজার নয়নের মণি। কোনো একদিন পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব তার বাবার কোলে বসেছিলেন। তা সহ্য করতে না পেরে, তাকে বলপূর্বক টেনে নামিয়ে দেন হিংসা পরায়ণা সত্ মা সুরুচি। ধ্রুব প্রতিবাদ করলে সুরুচি তাকে বলেন, অবাধ্য ছেলে যাও ভগবানের কাছ থেকে পিতার স্নেহ পাওয়ার অনুমতি নিয়ে এসো। ঘটনার আকস্মিকতায় রাজা উত্তানপাদ কোনোরূপ প্রতিবাদ করতে অসমর্থ হন কারন মাতৃ আজ্ঞা বলে কথা। বিষন্ন শিশুটি তার মায়ের কাছে ফিরে যায়। সে ভগবানের খোঁজে বেরোতে চায়। মা সুরুচি তাকে অনেকভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশুটি তার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে। অবশেষে তার মা তাকে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করার অনুমতি দেন। সে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথে নারদ মুনির সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনিও ওই ছোট্ট শিশুটিকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনো লাভ হয় না। অবশেষে তিনি ধ্রুবকে, নারায়ণ মন্ত্র ‘ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়’ জপ করতে বলেন। এরপর টানা ছয় মাস খাদ্য ও জল ছাড়াই ধ্রুব একমনে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করতে থাকেন। তার তপস্যার জোরে স্বর্গ কাঁপতে থাকে।

ভগবান বিষ্ণু তার সামনে উপস্থিত হন। ধ্রুব বিষ্ণুর আরাধনা করেন। তার স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে শ্রী বিষ্ণু তাকে তথাস্তু বলেন। এছাড়াও তাকে মৃত্যুর পর আকাশে অধিষ্ঠিত তারাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারা হবে বলে বর দেন।

এরপর ধ্রুব যতদিন বেঁচে ছিলেন, তার পিতা, মাতা, ও ভাইদের ভালবাসা ও সম্মান অর্জন করে সুখে ছিলেন। মৃত্যুর পর তার স্থান হয় আকাশে। মেরু তারকা হিসেবে পরিচিত হন ধ্রুব। উত্তর আকাশে অধিষ্ঠিত এই নক্ষত্র যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষের পথ চলতে সাহায্য করে চলেছে।

ছবিতে সপ্তর্ষির “ক” ও “খ” নামে যে দুটি তারা দেখা যাচ্ছে, তারা ধ্রুব নক্ষত্রের সঙ্গে সর্ব্বদাই প্রায় এক রেখায় থাকে।

“ক” ও “খ”কে যোগ করে করে মনে মনে একটা রেখা কল্পনা করে নিয়ে সেই রেখাকে নীচের দিকে বাড়িয়ে দিলে, রেখাটিকে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছ দিয়া যেতে দেখা যাবে। এই নক্ষত্রটিই ধ্রুব-তারা। এটি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আছে; সে দূরত্ব এত বেশি যে তার আলো পৃথিবীতে এসে পড়তে পথের মাঝেই সাতচল্লিশ বৎসর কেটে যায়।

ধ্রুব-তারা আকাশের ঠিক্ উত্তরে থাকে এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলও উত্তর আকাশে ঘুরে বেড়ায়। যদি গাড়ীতে বা নৌকায় যেতে যেতে রাত্রির অন্ধকারে কখনও পথ ভুল হয়ে যায়, তাহলে এই সব নক্ষত্রদের দেখে অনায়াসে দিক্ ঠিক করতে পারা যায়। অকূল সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক্ ঠিক করা বড় কঠিন হয়। জাহাজের কাপ্তেনেরা এই রকমে নক্ষত্র দেখেই পথ চিনে নেন। দিনের বেলায় যখন তারা দেখা যায় না, তখন সূর্য্যকে দেখে দিক্ ঠিক করতে হয়।

উত্তর আকাশে ক্যাসোপিয়া (Cassiopeia) নামে একটা বড় মজার মণ্ডল আছে। এর ভিতরকার নক্ষত্রগুলিকে সারি বেঁধে ঠিক ইংরাজি অক্ষর “M” বা “W”এর মত থাকতে দেখা যায়। এখানে ক্যাসোপিয়ার একটা ছবি দিলাম। এটা সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঠিক উল্টো দিকে থাকে।

অর্থাৎ ধ্রুব-তারার একদিকে সপ্তর্ষি এবং তার ঠিক উল্টো দিকে ক্যাসোপিয়াকে দেখা যায়। কাজেই বৎসরের যে মাসে সপ্তর্ষিকে দেখা যায় না, তখনি ক্যাসোপিয়াকে দেখা যায়।

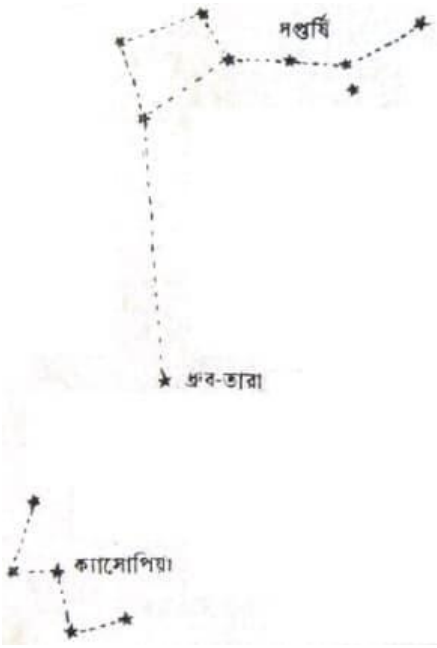
সপ্তর্ষি
ধ্রুব-তারা
ক্যাসোপিয়া

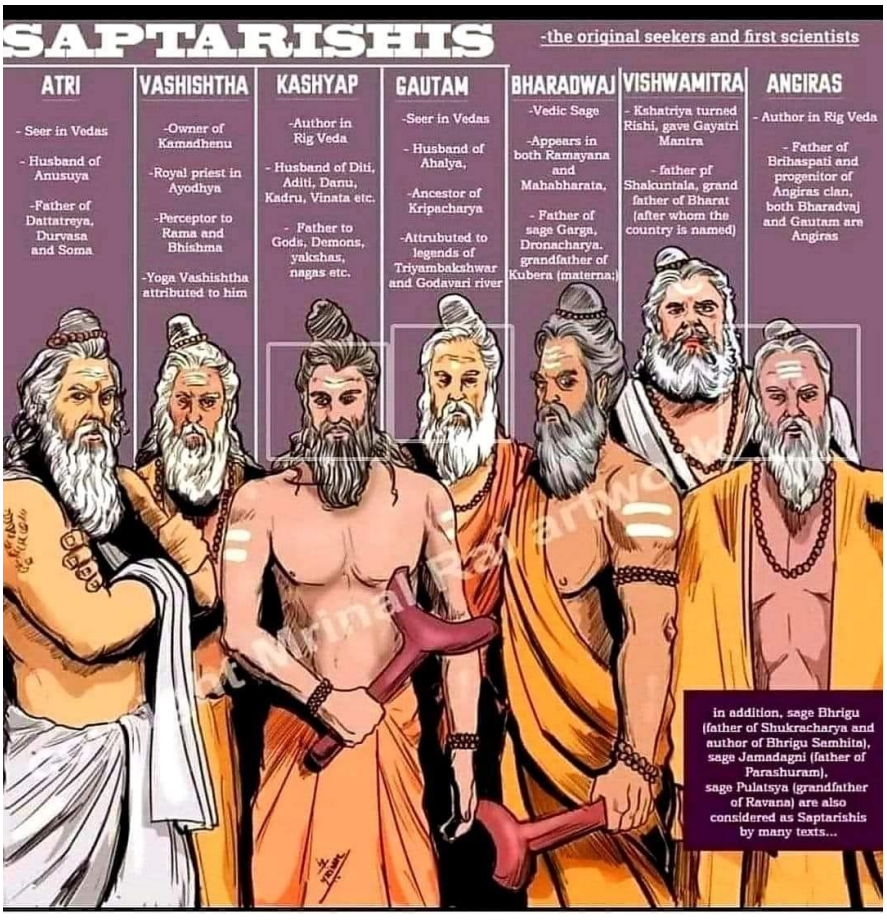
SAPTARISHIS
-the original seekers and first scientists
ATRI
- Seer in Vedas
- Husband of Anusuya
-Father of Dattatreya, Durvasa and Soma
VASHISHTHA
-Owner of Kamadhenu
-Royal priest in Ayodhya
-Perceptor to Rama and Bhishma
-Yoga Vashishtha attributed to him
KASHYAP
-Author in Rig Veda
- Husband of Diti, Aditi, Danu, Kadru, Vinata etc.
- Father to Gods, Demons, yakshas, nagas etc.
GAUTAM
-Seer in Vedas
- Husband of Ahalya,
-Ancestor of Kripacharya
-Attrubuted to legends of Triyambakshwar and Godavari river
BHARADWAJ
-Vedic Sage
-Appears in both Ramayana and Mahabharata,
- Father of sage Garga, Dronacharya. grandfather of Kubera (materna;)
VISHWAMITRA
- Kshatriya turned Rishi, gave Gayatri Mantra
- father pf Shakuntala, grand father of Bharat (after whom the country is named)
ANGIRAS
- Author in Rig Veda
- Father of Brihaspati and progenitor of Angiras clan, both Bharadvaj and Gautam are Angiras
in addition, sage Bhrigu (father of Shukracharya and author of Bhrigu Samhita), sage Jamadagni (father of Parashuram), sage Pulatsya (grandfather of Ravana) are also considered as Saptarishis by many texts...

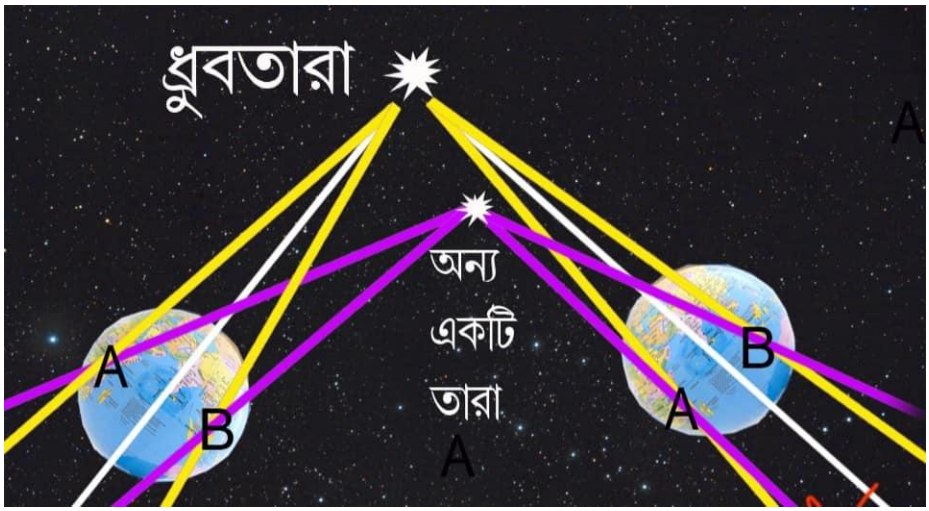
ধ্রুবতারা
A
অন্য
একটি
তারা
A
A
B
B
A

॥দ্বিতীয় পর্ব॥

মহাবিশ্বের সকল বস্তু ঘুরতে বাধ্য। মহাবিশ্বে নিশ্চল রয়েছে এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সবকিছুর মতো ঘুরছে ধ্রুবতারাও। কিন্তু এই তারাটি পৃথিবীর অক্ষের ওপর এর ঘূর্ণনের সঙ্গে একই গতিতে সামাঞ্জস্যপূর্ণভাবে আবর্তিত হয়। যে কারণে আপাত দৃষ্টিতে পৃথিবী থেকে ধ্রুবতারাকে মনে হয় নিশ্চল। এ কারণেই মনে হয় ধ্রুবতারার উদয় নেই, অস্ত নেই, গতি নেই। পৃথিবীর সবদেশ থেকেই একমাত্র ধ্রুবতারাকে সারাবছরই আকাশের উত্তরে নির্দিষ্ট স্থানে দেখা যায়। আর এই তারাকে চিনতে পারলেই উত্তর দিকের সন্ধান পাওয়া যায়, যা থেকে অন্য সকল দিকের সন্ধান পাওয়া যায়।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যার সময়ে উত্তর আকাশের বেশ একটু উঁচু জায়গায় ক্যাসোপিয়াকে দেখা যায়। কিন্তু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তাকে একেবারেই দেখা যাবে না; তখন সপ্তর্ষিকেই আকাশে দেখতে পাওয়া যাবে। ক্যাসোপিয়া ঠিক ছায়াপথের উপরে আছে; ছায়াপথ ধরে উত্তর আকাশে সন্ধান করলে উহার খোঁজ পাইবে। আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে তোমরা ঠিক মাথার উপরকার নক্ষত্রগুলির দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়ো। সেখানে একটি বড় নক্ষত্রমণ্ডল আছে। ইংরেজিতে এই মণ্ডলকে পেগাসস্ (Pegasus) বলে। এখানে এর একটা ছবি দিলাম। –এর চারটি বড় বড় নক্ষত্রে একটি বৃহৎ চতুর্ভুজের মত হয়েছে এবং তার এক কোণ থেকে তিনটা বড় বড় নক্ষত্র একে একে উত্তর আকাশের নীচে নেমেছে। চতুর্ভুজকে যদি একখানা বড় রকমের ঘুড়ি বলে ধরা যায়, তা হইলে নীচের তিনটি নক্ষত্রে ঘুড়ির লেজ হয়েছে মনে হয় না কি?

ধ্রুব-নক্ষত্রকে বোধ হয় চিনতে পারা গেছে। যদি চেনা গিয়ে থাকে, তবে ধ্রুবের উপরেই ক্যাসোপিয়াকে দেখা যাবে এবং ক্যাসোপিয়ার উপরে অর্থাৎ ঠিক মাথার উপরে পেগাসস্‌কে খুঁজে পাওয়া যাবে।

মনে হতে পারে, ঘুড়ি ও তাহার লেজ সকলকেই পেগাসস্ বলে, কিন্তু তা নয়। কেবল ঘুড়িখানাই পেগাসস্ এবং তার লেজের তিনটি তারা এন্‌ড্রোমিডা-মণ্ডল। তা হলে দেখতে হবে পেগাসসের লেজেই আর একটা নক্ষত্রমণ্ডল আছে।

পেগাসস্ ও এন্‌ড্রোমিডাকে যদি চেনা যায়, তা হলে পার্সুস্ রাশিকে চিনতে পারা যাবে। এই নক্ষত্রমণ্ডল পেগাসসের লেজের শেষ তারাটিতে আরম্ভ হয়েছে। ছবিতে দেখা যাবে, লেজের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে গোটা তিনেক নক্ষত্র রয়েছে, এগুলি পার্সুস্ রাশির নক্ষত্র। আমরা আগে “আল্‌গল” অর্থাৎ “দৈত্য-তারা”র নাম শুনেছি। এটি বেশ উজ্জ্বল তারা কিন্তু প্রায় তিন দিন অন্তর এর আলো ভয়ানক কমে আসে। এই অদ্ভুত নক্ষত্রকে পার্সুস্-মণ্ডলে দেখা যায়। কোথায় খুঁজলে সন্ধান পাওয়া যাবে তা ছবিতে এঁকে দিলাম। ছবি দেখে আকাশে পার্সুস্‌কে চিনে নেওয়া যাক এবং তার পরে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে আল্‌গলের সন্ধান করতে হবে,–তাকে নিশ্চিত দেখা যাবে। একে একে অনেকগুলি নক্ষত্রমণ্ডলের কথা হল। ক্যাসোপিয়া, এন্‌ড্রোমিডা, পার্সুস্,–এ সকলই ইংরাজি নাম। এদের বাংলা বা সংস্কৃত নাম নেই । এই নামগুলির সঙ্গে কতকগুলি মজার গল্প আছে।

একটা গল্প এরকম।

অনেক দিন আগে গ্রীস্‌দেশে সিফস্‌ (Cepheus) নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল ক্যাসোপিয়া। রাজা ও রাণী অনেক দিন সুখে রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের পুত্র সন্তান ছিল না। এন্‌ড্রোমিডা নামে কেবল এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার রূপ ও গুণের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল ।

এমন সুখের রাজ্যেও কিন্তু মহা ভয় দেখা দিল। রাজধানীর নিকটে একটা কিম্ভূতকিমাকার রাক্ষস এসে প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ খেতে আরম্ভ করল। যারা রাক্ষসটাকে দেখেয়েছিল তারা বলতে লাগিল,—ওর শরীরের পিছনটা সাপের মত, সম্মুখটা কুমীরের মত, তার উপরে আবার দুই পাশে দুটো বড় বড় ডানা! যাহোক জলে স্থলে আকাশে সব জায়গায় সে অনায়াসে বেড়িয়ে ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করল। জালে ধরতে গেলে সে জাল খণ্ড খণ্ড করে কাটতে লাগল,—শিকারীদের বাণ তার গায়ে ঠেকে বেঁকে যেতে লাগল।

রাজা গণক ঠাকুরকে ডাকলেন। অনেক পাঁজিপুথি ঘেঁটে ঠাকুর বললেন,—এই রাক্ষস সামান্য নয়। এর নাম হাইড্রা (Hydra)। স্বয়ং জলদেবতা রাগ করে সিফসের রাজ্য নষ্ট করবার জন্য ওকে পাঠিয়েছেন। জলদেবতার অনেকগুলি সুন্দরী কন্যা ছিল; কিন্তু রাজকুমারী এন্‌ড্রোমিডার রূপগুণ তাদের চেয়েও বেশি। এই দেখে জলদেবতা এন্‌ড্রোমিডাকে হত্যা করবার জন্য হাইড্রা রাক্ষসকে পাঠিয়েছেন।

দেশময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, এন্‌ড্রোমিডাকে খেতে না পারলে হাইড্রা রাজ্য ছাড়বে না। রাজা ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়িলেন। প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে রাজবাড়িতে এসে এন্‌ড্রোমিডার খোঁজ করতে লাগল।

রাজা ও রাণী কন্যাকে কিছুক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলেন লুকাইয়া বটে, কিন্তু একেবারে সকলকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। মত্ত প্রজারা এন্‌ড্রোমিডাকে ধরে ফেলল এবং নদীর ধারের এক পাহাড়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখল। তারা ভাবতে লাগল, সেই রাক্ষসটা রাত্রিতে এন্‌ড্রোমিডাকে খেয়ে পরদিন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। রাজা ও রাণী এন্‌ড্রোমিডার জন্য কেঁদে কেঁদে পাগলের মত হয়ে গেলেন এবং এন্‌ড্রোমিডা হাতে পায়ে শিকল পরে একলাটি কাঁদতে লাগলেন।

রাত্রি দুপুর হয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে বোধ হয় এন্‌ড্রোমিডার একটু ঘুম এসেছিল;—এমন সময়ে খুব বড় একটা পাখীর ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি মনে করলেন, এইবার বুঝি রাক্ষস আসল। ভয়ে ভয়ে চোখ খুললেন, কিন্তু রাক্ষসকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন, এক পরমসুন্দর বীরপুরুষ তীর-ধনুক হাতে করে সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পায়ের খড়মের সঙ্গে দুটা পাখীর ডানা বাঁধা,—সেই ডানায় ভর করে তিনি কোথা থেকে উড়ে এসেছেন। বীরপুরুষ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তাঁর নাম পার্সুস্‌, বিপদের কথা শুনে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে এসেছেন।

পার্সুস্‌কে কাছে পেয়ে এন্‌ড্রোমিডা খুব খুসী হলেন এবং তাঁর ভয়ও কমল। পার্সুস্ রাজকুমারীকে ভরসা দিয়ে নিকটের এক জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন ।
রাত্রি যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে , তখন হাতীর ডাকের মত একটা শব্দে এন্‌ড্রোমিডা চমকে উঠলেন। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, জল তোলপাড় করে দশটা হাতীর মত দেহ নিয়ে হাইড্রা-রাক্ষস পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছে । কিন্তু তাকে আর বেশি দূর আসতে হল না, পার্সুসের দুইটা তীরের আঘাতে তার দেহ দুই খণ্ড হয়ে গেল!

ভোর হলে লোকে ভাবল, এন্‌ড্রোমিডাকে বুঝি রাক্ষসে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু যখন তারা শুনিল, বীর পার্সুস্ রাক্ষস বধ করে এন্‌ড্রোমিডাকে উদ্ধার করেছেন, তখন তারা খুবই আশ্চর্য্য হল। রাজা ও রাণী কন্যাকে ফিরে পেয়ে পরম সুখী হলেন। দেশে আবার শান্তি ফিরে এলো। রাজা সিফস্ খুসী হয়ে এন্‌ড্রোমিডার সঙ্গে পার্সুসের বিবাহ দিলেন এবং অর্দ্ধেক রাজ্য মেয়ে জামাইকে দান করলেন।

এই যে গল্পটি এটি সত্য নয়। কিন্তু এতে আগে গ্রীসের লোকেরা বিশ্বাস করত; এবং বলত, রাণী ক্যাসোপিয়া, রাজ-জামাতা পার্সুস্ এবং রাজকন্যা এন্‌ড্রোমিডা মৃত্যুর পর এক-একটা নক্ষত্রমণ্ডল হয়ে আকাশে রয়েছেন। সিফস্ এবং হাইড্রাও উত্তর-আকাশের দুই স্থানে আছে।

পার্সুস্ উত্তর আকাশের একটি তারামণ্ডল। মণ্ডলটির ইংরেজি নাম পারসিয়াস (parseus) যা এসেছে গ্রিক পুরাণের নায়ক পের্সেউস-এর নাম থেকে। দ্বিতীয় শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি যে ৪৮টি তারামণ্ডলের তালিকা করেছিলেন, এটি তার একটি। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন কর্তৃক সংজ্ঞায়িত আধুনিক ৮৮টি তারামণ্ডলের মধ্যেও এটি অন্তর্ভুক্ত আছে। এই মণ্ডলের বিখ্যাত জ্যোতিষ্ক এবং জ্যোতিষ্ক সমষ্টিগুলো হচ্ছে: অ্যালগল নামের একটি বিষমতারা, পারসিডস নামের একটি উল্কাবৃষ্টি এবং বিখ্যাত পার্সুস্ স্তবক (অনেকগুলো ছায়াপথের গুচ্ছ)।

ধ্রুবমাতা মণ্ডল বা অ্যান্দ্রোমিডা (Andromeda পুরুষ জাতির অভিভাবক) আধুনিক ৮৮টি তারামণ্ডলের একটি। গ্রিক পুরাণের জনপ্রিয় চরিত্র রাজকুমারী অ্যান্দ্রোমিডার নামানুসারে এর ইংরেজি নামকরণ করা হয়েছে। উত্তর আকাশে পক্ষীরাজ মণ্ডলের নিকটে এই তারামণ্ডলটি অবস্থিত। অ্যানড্রোমিডা ছায়াপথ ধারণ করার জন্য এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ইংরেজিতে একে মাঝে মাঝেই “দ্য চেইন্‌ড মেইডেন” তথা শৃঙ্খলিত রাজকুমারী বলা হয়ে থাকে।

যখন নক্ষত্রের বড় ম্যাপ দেখে তারা চেনা শেখা যায়, তখন ঐ দুইটি নক্ষত্র-মণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায়। যাই হোক এখন অন্য নক্ষত্র-মণ্ডলের পরিচয় দেওয়া যাক। একটা ছবি দিলাম। দেখলেই বোঝা যাবে, ছবিতে ধ্রুব-তারা ও ক্যাসোপিয়া আছে। তার পরে পার্সুসের সেই তিনটি তারাও আছে। কিন্তু পার্সুস্-মণ্ডল এখানে শেষ হয়নি । ছবিতে দেখা যাবে, একগাছি মালার মত বেঁকে গিয়ে পার্সুসের অপর তারাগুলি “সাতভাই” মণ্ডলে ঠেকেছে ।

“সাত ভাইকে” আকাশে দেখলে কেউ কেউ একে “সাত বোন্”ও বলে। অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার পরে একে পূর্ব্ব-আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। দেখলে মনে হবে, যেন কতকগুলি জোনাকী পোকা জড় হয়ে মিট্‌মিট্ করছে। চেষ্টা করলে এতে অনায়াসে ছয়টি তারা গুণে বের করা যায় । দূরবীণে কিন্তু “সাত ভাইয়ে” প্রায় চারশত নক্ষত্র দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই সব নক্ষত্রকে কৃত্তিকা-রাশি বলতেন। ইহা এটা বৃষরাশিরই একটা অংশ।

কৃত্তিকা অর্থাৎ “সাত-ভাইয়ের” নীচেই রোহিণীকে দেখা যায়। এটি লাল রঙের বেশ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিন কোণার মত যে একটু জায়গায় অনেকগুলি নক্ষত্রকে জটলা করতে দেখা যায়, সেখানেই রোহিণীকে খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা বলতেন, রোহিণী চন্দ্রের স্ত্রী এবং বুধ গ্রহটি রোহিণী ও চন্দ্রের পুত্র। আকাশে “কালপুরুষ” নামক নক্ষত্রমণ্ডলকে সমস্ত আকাশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মণ্ডল মনে। এখানে তার একটা ছবি দিলাম।

যেন একটা মানুষের চেহারা হয়েছে। তার হাতে ধনুক মত আছে, কোমরে কোমর-বন্ধ আছে; কোমর-বন্ধে তলোয়ার ঝুলানো আছে। এটাই কাল-পুরুষ। এর ইংরাজি নাম ওরায়েন্ (Orion)।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পরে, পূর্ব্ব-আকাশে তাকালেই কাল-পুরুষকে দেখা যাবে । মাঘ মাসের সন্ধ্যায় তাকে প্রায় মাথার উপরে দেখি। তার পরে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যাকালে তাকে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যাবে। আগে আমরা কাল-পুরুষের যে একটি নীহারিকার ছবি দিয়েছি, তা এরই কোমরবন্ধের নীচে তলোয়ার খানির মধ্যে আছে। যদি দূরবীণ দিয়া কখনো নক্ষত্র দেখার সুবিধা হয়, ঐ নীহারিকাটিকে একবার দেখে নেওয়া উচিৎ।

কালপুরুষ আকাশের সবচেয়ে পরিচিত তারামন্ডল হিসেবে গণ্য হতে পারে। এই মন্ডলটি খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়। শিকারী নামে সুপরিচিত এই মন্ডলের উল্লেখযোগ্য তারাগুলো মহাকাশের বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান করায় পৃথিবীর সব অঞ্চল থেকে একে দেখা যায়। উত্তর গোলার্ধে শীত শেষ সময় হতে বসন্তের প্রাথমিক সময় পর্যন্ত কালপুরুষ মন্ডলটি দেখা যায়।

কালপুরুষ মন্ডলে প্রচুর উজ্জ্বল তারা এবং গভীর আকাশের বস্তু রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য তারাসমূহের নাম উল্লেখিত হল:

• ল্যাম্বডা অরিয়নিস (Meissa) হল কালপুরুষের মাথা। অবশ্য আর্দ্রার উত্তরে বেশ কয়েকটি তারা দেখা যায় যার সবকটিই মাথা গঠন করে। বাংলায় এদের একত্রে মৃগশিরা বলা হয়।

• জেটা অরিয়নিস (Alnitak-ঊষা), এপসাইলন অরিয়নিস (Alnilam-অনিরুদ্ধ) এবং ডেল্টা অরিয়নিস (Mintaka -চিত্রলেখ) নামক তারা তিনটি পূর্ব আকাশে লুব্ধকের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে থাকে এবং এই

যুক্ততারাটি (Asterism) কালপুরুষের কোমরবন্ধ গঠন করে। এই তারাসমষ্টিটি এক সরলরেখায় উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মুখ করে অবস্থান করে। সর্ব উত্তরে চিত্রলেখ এবং সর্বদক্ষিণে ঊষা অবস্থান করে।

• আলফা অরিয়নিস বা আর্দ্রা তারাটি এর ডান কাঁধে অবস্থিত। এটি লাল বর্ণের তারা যার ব্যস শুক্র গ্রহের চেয়ে বেশি। কোমরবন্ধের তারাসমষ্টিটির উত্তরে দুইটি তারা আছে এবং এদুটির মধ্যে পূর্বদিকের তারাটিই হল আর্দ্রা। এটি কালপুরুষ মন্ডলের প্রথম তারা হলেও বাণরাজা (Rigel) অপেক্ষা মৃদু।

• গামা অরিয়নিস (Bellatrix-কার্তিকেয়) তারাটি এর বাম কাঁধে অবস্থিত। আর্দ্রার পশ্চিম দিকে তাকালে অতি সহজেই তারাটি চোখে পড়ে। এর অপর নাম হচ্ছে নারী যোদ্ধা বা Warrior woman।

• কার্তিকেয়'র পশ্চিমে ছোট ছোট কয়েকটি তারা ধনুকের আকৃতি ধারণ করে আছে দেখা যায়। এগুলো কালপুরুষের হাতের দন্ডের আকার দেয়।

• কাপ্পা অরিয়নিস (Saiph-কার্তবীর্য) ডান পায়ের হাটুর তারা। কোমরবন্ধের নিচে পূর্বদিকে এর অবস্থান।

• বিটা অরিয়নিস (Rigel-বাণরাজা) বাঁ পায়ের তারা যা কোমরবন্ধের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এটি একটি অতিদানব নীলাভ-সাদা তারা। আকাশের উজ্জ্বলতম তারাগুলোর অন্যতম।

• আইওটা অরিয়নিস (Hatsya) তারাটি কালপুরুষের তরবারির ডগায় অবস্থিত।

• ইটা অরিয়নিস তারাটি ডেল্টা অরিয়নিস এবং বাণরাজা তারাদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

কালপুরুষ তারামণ্ডলের বর্তমান আকৃতি আজ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ বছর পূর্বে গঠিত হয়েছিলো। পৃথিবীর সাপেক্ষে এর তারাগুলোর আপেক্ষিক গতি কম হওয়ার কারণে আজ থেকে আরও ১০/২০ লক্ষ বছর পর্যন্ত কালপুরুষ তারামণ্ডলকে রাতের আকাশে দেখা যাবে। অর্থাৎ এটিই দৃশ্যমান মণ্ডলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় পর্যবেক্ষণযোগ্য থাকবে। আরও একটি সুবিধা হল এই মণ্ডলের আবির্ভাব মানব সভ্যতার সমসাময়িক কালে হয়েছে। (স্কাইচার্ট ৩ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে) সুমেরীয়রা কালপুরুষ তারামণ্ডলকে একটি জাহাজ হিসেবে কল্পনা করত। প্রাচীন চীনে এটি ছিল রাশিচক্রের ২৮ টি রাশির একটি যার প্রতীক ছিল Xiu (宿)। এই রাশিটি সেখানে শেন নামে পরিচিত ছিল যার অর্থ তিন। কালপুরুষের কোমরবন্ধের তিনটি তারা দেখেই তারা এই নামকরণ করেছিল।

প্রাচীন মিশরে এই মণ্ডলের তারাগুলো মৃত্যু এবং পাতালপুরীর দেবী অসিরিসের সাথে সম্পর্কিত ছিল। বলা হয়ে থাকে যে গিজা পিরামিড কমপ্লেক্স এই কালপুরুষের কোমরবন্ধের তিনটি তারার খ-মানচিত্র অনুসারে তৈরি করা হয়েছে। এই কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে গিজার গ্রেট পিরামিড, খফ্রুর পিরামিড এবং মেঙ্কাউ-রার পিরামিড।

কালপুরুষের কোমরবন্ধ এবং তরবারি নিয়ে প্রাচীন এবং আধুনিক অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। বর্তমানকালেও যুক্তরাষ্ট্রের ২৭ পদাতিক ডিভিশনের কর্মকর্তা ও সৈন্যদের কাঁধের প্রতীক হিসেবে কালপুরুষের কোমরবন্ধ এবং তরবারি ব্যবহৃত হয়। এর একটি কারণ হতে পারে এই ডিভিশনের প্রথম সেনাপতি ছিলেন জন এফ অরিয়ান। একটি পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায় শিকারের দেবী আরটামিস এবং চাঁদ কালপুরুষের প্রেমে পড়ে আকাশকে আলোকিত করা বন্ধ করে দেয়।

“কালপুরুষকে” নিয়ে যে গল্প আছে, তা আবার অন্য রকম। প্রজাপতি ও ঊষা নামে দুইটি দেবতার কথা আমাদের অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বেদে লেখা আছে। গল্পে শুনা যায়, প্রজাপতি ও ঊষা হরিণের আকৃতি নিয়ে নাকি কালপুরুষদের তারার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

ঐ দুই নক্ষত্রমণ্ডল-সম্বন্ধে ইংরেজিতে যে গল্প আছে, তা বড় মজার।

আমাদের সরস্বতী যেমন বিদ্যার দেবতা, গ্রীকদের ডিয়ানা নামে সেই রকম এক দেবী ছিলেন। তাঁকে সকলে চন্দ্র-সূর্য্যের আলোর দেবতা বলেও মানত। ডিয়ানার ছয় জন সখী ছিল। তাদের কাজকর্ম্ম বেশি ছিল না; এইজন্য ডিয়ানা দেবী রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়লে তারা জ্যোৎস্নার আলোতে পাহাড়-পর্ব্বতে বেড়িয়ে গান করত ও নাচত। এই সময়ে গ্রীস দেশে ওরায়েন্ নামে একজন ব্যাধ ছিল। সে পাহাড়-পর্ব্বতে শিকার করে বেড়াতো। একদিন ঐ ছয় সখীদের সঙ্গে ওরায়নের দেখা হয়ে গেল। তার হাতে ধনুক-বাণ ঢাল-তলোয়ার ছিল, তার উপরে চেহারাটাও যমদূতের মত ভয়ানক ছিল। এই সব দেখে শুনে সখীরা ভয় পেয়ে পালাতে লাগল। ওরায়েন্ ভাবল এ কি কাণ্ড! ওরা দৌড়ায় কেন? সে মজা দেখবার জন্য সখীদের পিছনে দৌড়তে লাগল কিন্তু তাদের ধরতে পারল না। ধরা পড়বার আগেই ছয় সখী ছয়টি পায়রার মূর্ত্তি গ্রহণ করে আকাশে উড়তে লাগিল এবং দেখতে দেখতে অনেক উপরে উঠে ছয়টি নক্ষত্রের আকারে আকাশে ভেসে রইলো। গ্রীস্ দেশের লোকেরা বলে, ঐ ছয়টি নক্ষত্রই একত্র হয়ে আজও আকাশে রয়েছে । এরাই আমাদের “সাতভাই” অর্থাৎ কৃত্তিকা-রাশি। আর সেই ব্যাধটিই কালপুরুষ। এইজন্যই ইংরাজিতে কালপুরুষকে আজও ওরায়েন্ বা ওরিওন বলা হয়।

কালপুরুষ আকাশে উঠে বাস করতে আরম্ভ করলে, তার পোষা শিকারী কুকুরটাকে ছাড়তে পারেনি। সেও এখন একটা নক্ষত্র-মণ্ডল হয়ে আকাশে আছে। ছবিতে কুকুর-মণ্ডল দেখা যাবে। এর মাঝে যে উজ্জ্বল তারাটি রয়েছে, তাকে চিনিতে কষ্ট হবে না। এই নক্ষত্রকে ইংরাজিতে সিরিয়স্ (Sirius) বা ডগ্-ষ্টার অর্থাৎ কুকুর-নক্ষত্র বলা হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এর নাম দিয়েছেন “লুব্ধক।” লুব্ধকের চেয়ে উজ্জ্বল তারা সমস্ত আকাশেও খুঁজেও মেলে না। কিন্তু এ অনেক দুরের নক্ষত্র,—এর আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পথের মাঝে সাত আট বৎসর কাটিয়ে দেয়। ভেবে দেখার কথা লুব্ধক কত দূরে আছে। আগে যে রোহিণী (Aldebern) নক্ষত্রের কথা বলেছি, তা আরো দূরে আছে। এর আলো বত্রিশ বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছায়!

যাই হোক আমরা যে ছবি পেলাম, তার সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রদের মিলিয়ে লুব্ধককে চিনে নেওয়া যাবে।

অনেক নক্ষত্র-মণ্ডলের কথা বলা হল। সেসব বুঝে আর ছবি দেখে উত্তর আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলগুলিকে চিনতে পারা যাবে। এই রকম চেনা-পরিচয় হলে যদি নক্ষত্রদের একখানা ভাল মানচিত্র হাতে আসে, তা হলে আকাশের অপর অংশের মণ্ডলগুলিকে চিনতে একটুও কষ্ট হবে না।

"সাতভাই" সম্বন্ধেও অনেক গল্প শোনা যায়। "সাতভাই"কে আমাদের দেশের কোনো কোনো জ্যোতিষী "মাতৃমণ্ডল" নাম দিয়েছেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল, মাতৃমণ্ডলের ছয়টি তারা সপ্তর্ষি-মণ্ডলের ছয়জন ঋষির স্ত্রী।
বসন্তের শুরু, সূর্য উত্তরায়ণে। দিন কয়েক আগেই গিয়েছে মহাবিষুব। বিষুব রেখা পার করে উত্তর গোলার্ধে প্রবেশ করেছেন সুয্যিমামা। দুপুরে বাইরে বেরোলে তার টেরও মিলছে। ফাল্গুন মাসে সূর্য রয়েছে কুম্ভ রাশিতে। আর এখনো তেমন কালবৈশাখির দেখা না মেলায় আকাশও ঝকঝকে পরিষ্কার। তাই রাতভর আকাশজোড়া ঝলমল করছে সব তারা। একটু চেষ্টা করলেই চিনে নিতে পারা যায় সন্ধ্যার আকাশ।

সূর্য ডুবলেই পশ্চিম আকাশে এখন হিরের মতো জ্বলজ্বল করছে সন্ধ্যাতারা। যা আসলে শুক্রগ্রহ। হাতের কাছে DSLR ক্যামেরা আর টেলিফটো লেন্স থাকলে ট্রাইপডের সাহায্যে ছবিও তুলে ফেলা যায়। আর ছোটখাটো একটা টেলিস্কোপ থাকলে তো কথাই নেই। এই মুহূর্তে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে সন্ধ্যার আকাশে অন্য কোনও গ্রহ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে দেখা মিলতে পারে একঝাঁক তারার।

ঠিক সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার পর মাথার ওপর থাকবে মিথুন বা জেমিনি রাশি। ঝকঝক করবে তার ২টি তারা পোলাক্স ও কাস্টর। এই ২ তারাকে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় বলা হয় পুনর্বসু নক্ষত্র। পশ্চিমি জ্যোতির্বিদ্যায় ২ ভাই বলে মনে করা হয়। এই ২ তারার দূরত্ব আকাশে অন্য তারাদের দূরত্ব মাপতে ব্যবহার করেন স্কাই ওয়াচাররা। তখনই দক্ষিণ আকাশে দেখা যাবে রাতের আকাশের সব থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধককে। তার পাশে দক্ষিণ পশ্চিম আকাশে দেখা মিলবে কালপুরুষের। উত্তর পশ্চিম আকাশে দেখা পাওয়া যাবে ব্রহ্মহৃদয় তারার। সন্ধ্যাতারার কিছুটা ওপরে পশ্চিম আকাশে দেখা যাবে রোহিনী নক্ষত্রকে। তার ওপরে দক্ষিণ পশ্চিম আকাশে থাকবে কালপুরুষের সব থেকে উজ্জ্বল তারা আদ্রা। কালপুরুষের পায়ের কাছে দেখা যাবে মৃগশিরা নক্ষত্র।

রাত ৯টা নাগাদ মাঝ আকাশে থাকবে সিংহরাশি। দেখা যাবে এই রাশির তারা পূর্ব ফাল্গুনি ও উত্তর ফাল্গুনির। পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্র সিংহের কোমরের ২ টি তারাকে একসঙ্গে বলা হয়। উত্তর ফাল্গুনি নক্ষত্র সিংহের লেজ গঠন করে। যে নক্ষত্রের নাম অনুসারে এই মাসের নাম ফাল্গুন। তখন তার উত্তর দিকে তার পাশেই দেখা মিলবে সপ্তর্ষি মণ্ডলের। পূর্ব দিকে তখন দেখা মিলবে লাল রঙের স্বাতী নক্ষত্রের। দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরাল রেখা টেনে একটু দক্ষিণ দিকে তাকালে দেখা মিলবে চিত্রা নক্ষত্রের। রাত ১০.৩০ মিনিটের পর দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে দেখা মিলবে বিশাখা নক্ষত্রের। গভীর রাতে উঠবে আকাশগঙ্গা। ভোররাতে তাকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে দেখা যাবে মাঝ আকাশ বরাবর। তখন দক্ষিণ পূর্ব আকাশে দেখা মিলবে তিনটি গ্রহের, বৃহস্পতি, শনি ও মঙ্গল।

বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা কয়েক হাজার বছরের পুরনো। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এই বাংলায় বসেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করেছিলেন ভারতের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির।

উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার কাছে ইছামতী নদীর পাশে তারাগনিয়া গ্রামে বসে তিনি নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন বলে মনে করা হয়। কাছেই চন্দ্রকেতুগড়ে বৌদ্ধ মঠে অধ্যাপনা করতেন তিনি।

সৌরজগৎ

******

সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধের বাঁধন বিচার করলে দেখা যায় গ্রহগুলির প্রদক্ষিণের রাস্তা সূর্যের বিষুবরেখার প্রায় সমক্ষেত্রে। এই গেল এক। আর এক কথা, সূর্য যেদিক দিয়ে আপন মেরুদণ্ডকে বেষ্টন করে ঘুর দেয়, গ্রহেরাও সেই দিক দিয়ে পাক খায় আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এর থেকে বোঝা যায় সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধ জন্মগত। তাদের সেই জন্মবিবরণের আলোচনা করা যাক।

নক্ষত্রেরা পরস্পর বহু কোটি মাইল দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে তাদের গায়ে পড়া বা অতিশয় কাছে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। কেউ কেউ আন্দাজ করেন যে, প্রায় দুশো কোটি বছর আগে এইরকমের একটি দুঃসম্ভব ঘটনাই হয়তো ঘটেছিল। একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র এসে পড়েছিল তখনকার যুগের সূর্যের কাছে। ঐ নক্ষত্রের টানে সূর্য এবং আগন্তুক নক্ষত্রের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে উথলে উঠল অগ্নিবাষ্পের জোয়ারের ঢেউ। অবশেষে টানের চোটে কোনো কোনো ঢেউ বেড়ে উঠতে উঠতে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। সেই বড়ো নক্ষত্র হয়তো এদের কতকগুলোকে আত্মসাৎ করে থাকবে, বাকিগুলো সূর্যের প্রবল টানে তখন থেকে ঘুরতে লাগল সূর্যের চারি দিকে। তেজ ছড়িয়ে দিয়ে এরা ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হল। সেই ছোটো-বড়ো জ্বলন্ত বাষ্পের টুকরোগুলি থেকেই গ্রহদের উৎপত্তি, পৃথিবী তাদেরই মধ্যে একটি। এরা ক্রমশ আপন তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গ্রহের আকার ধরেছে। আকাশে নক্ষত্রের দূরত্ব, সংখ্যা ও গতি হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রায় পাঁচ-ছ' হাজার কোটি বছরে একবার মাত্র এরকম অপঘাত ঘটতেও পারে। গ্রহসৃষ্টির এই মত মেনে নিলে বলতে হবে যে গ্রহ পরিচয়ওয়ালা নক্ষত্রসৃষ্টি এই বিশ্বে প্রায় অঘটনীয় ব্যাপার। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ডগোলকসীমা ফেঁপে উঠতে উঠতে নক্ষত্রেরা ক্রমশই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এ মত যদি স্বীকার করতে হয় তা হলে পূর্বযুগে আকাশগোলক যখন সংকীর্ণ ছিল তখন তারায় তারায় ঠোকাঠুকির ব্যাপার সদা-সর্বদা ঘটত বলে ধরে নিতে হয়। সেই নক্ষত্র-মেলার ভিড়ের দিনে অনেক নক্ষত্রেরই ছিন্ন অংশ থেকে গ্রহের উৎপত্তি সম্ভাবনা ছিল এ কথা যুক্তিসংগত।

যে অবস্থায় আমাদের সূর্য অন্য সূর্যের ঠেলা খেয়েছিল সেই অবস্থাটা সেই সংকুচিত বিশ্বের দিনে এখনকার হিসাবমতে দূর সম্ভাবনীয় ছিল না বলেই মনে করে নিতে হবে। যাঁরা এই মত মেনে নেন নি তাঁদের অনেকে বলেন যে, প্রত্যেক নক্ষত্রের বিকাশের বিশেষ অবস্থায় ক্রমশ এমন একটা সময় আসে যখন সে পাকা শিমূলফলের মতো ফেটে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে চারি দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবাষ্প ছড়িয়ে ফেলে দেয়। কোনো কোনো নক্ষত্র থেকে হঠাৎ এরকম জ্বলন্ত গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। ছোটো একটি নক্ষত্র ছিল, কয়েক বছর আগে তাকে ভালো দুরবীন ছাড়া কখনো দেখা যায় নি। এক সময় দীপ্তিতে সে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠল। আবার কয়েক মাস পরে আস্তে আস্তে তার প্রবল প্রতাপ এত ক্ষীণ হয়ে গেল যে, পূর্বের মতোই তাকে দুরবীন ছাড়া দেখাই গেল না। উজ্জ্বল অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে এই নক্ষত্রটি পুঞ্জপুঞ্জ যে জ্বলন্ত বাষ্প চারি দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সেইগুলিই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি ঘটাতে পারে

বলে অনুমান করা অসংগত নয়। এই মত স্বীকার করলে বলতে হবে যে কোটি কোটি নক্ষত্র এই অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, অতএব সৌরজগতের মতোই আপন আপন গ্রহদলে কোটি কোটি নাক্ষত্রজগৎ এই বিশ্ব পূর্ণ করে আছে। পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র তারও যদি গ্রহমণ্ডলী থাকে তবে তা দেখতে হলে যত বড়ো দুরবীনের দরকার তা আজও তৈরি হয় নি।

অল্প কিছুদিন হল কেম্ব্রিজের এক তরুণ পণ্ডিত লিট্‌লটন সৌরজগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করেছেন। পূর্বেই বলেছি আকাশে অনেক জোড়ানক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। এঁর মতে আমাদের সূর্যেরও একটি জুড়ি ছিল। ঘুরতে ঘুরতে আর-একটা ভবঘুরে জ্যোতিষ্ক এসে এই অনুচরের গায়ে পড়ে ধাক্কা মেরে তাকে অনেক দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

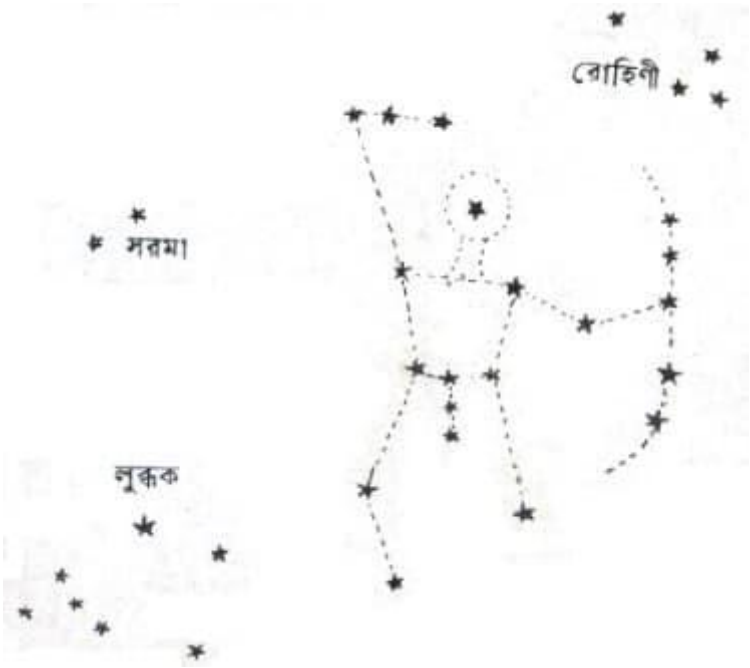
রোহিণী
সরমা
লুব্ধক

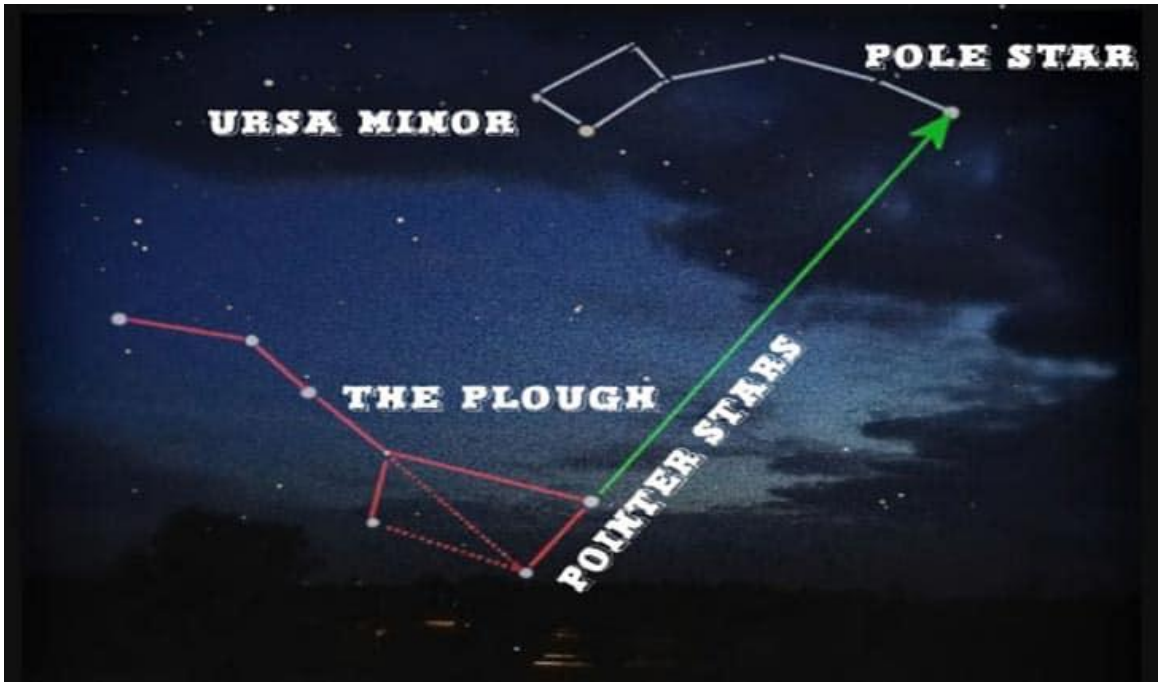
POLE STAR
URSA MINOR
THE PLOUGH
POINTER STARS

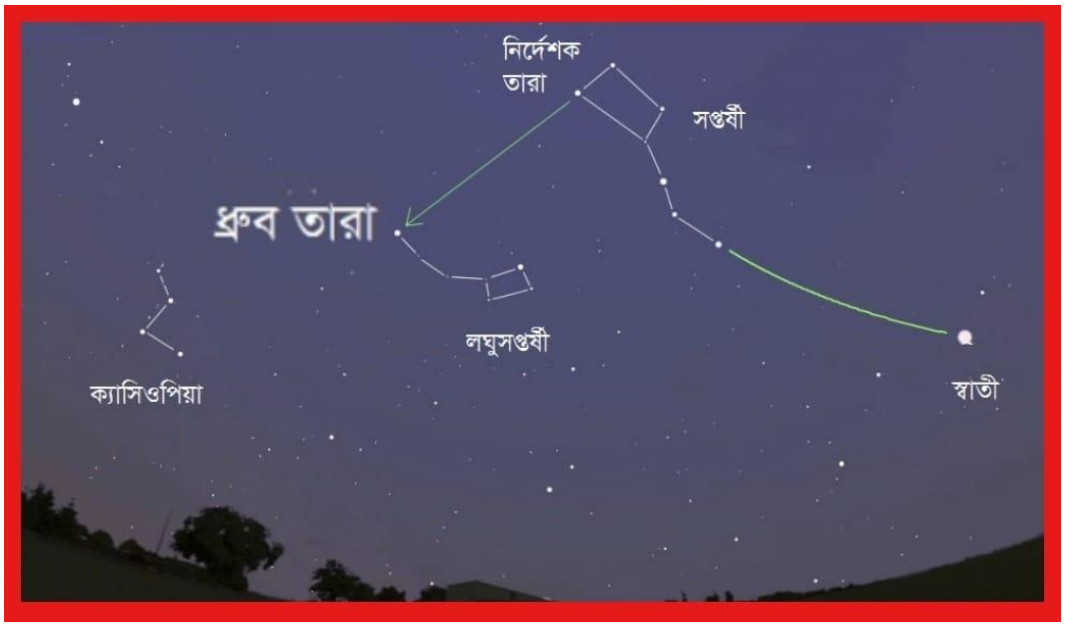

নির্দেশক
তারা
সপ্তর্ষী
ধ্রুব তারা
লঘুসপ্তর্ষী
ক্যাসিওপিয়া
স্বাতী

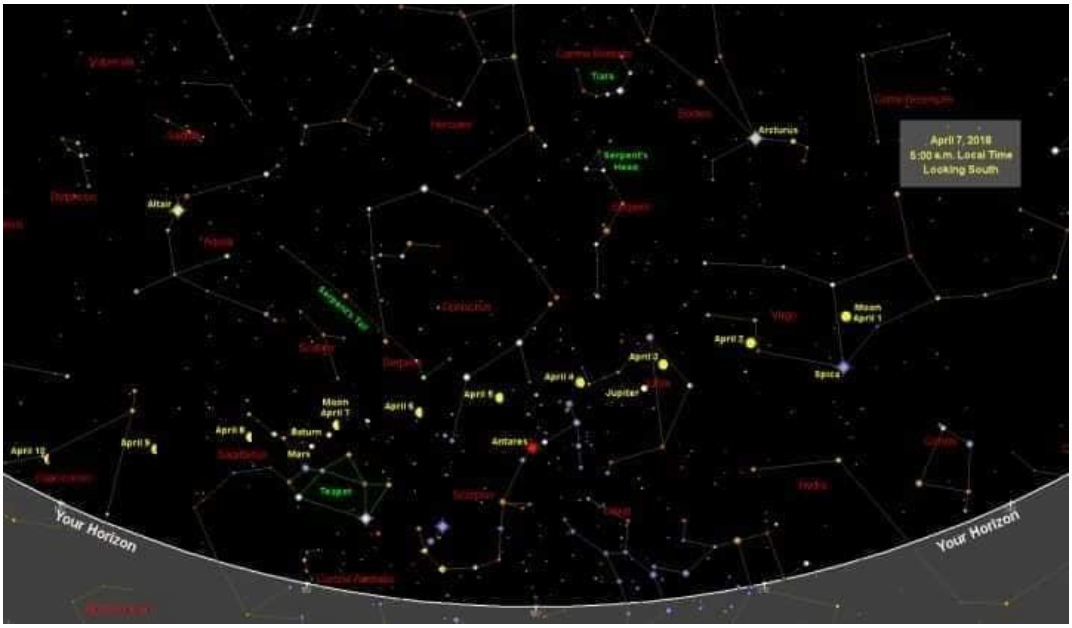

April 7, 2018
5:00 a.m. Local Time
Looking South
Arcturus
Altair
Spica
Jupiter
Antares
Saturn
Mars
Your Horizon
Your Horizon

॥তৃতীয় পর্ব॥

জ্যোতির্বিজ্ঞান

****

জ্যোতির্বিজ্ঞান (ইংরেজি Astronomy) হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। এই শাখায় গ্রহ, প্রাকৃতিক। এই শাখায় গ্রহ, প্রাকৃতিক উপগ্রহ, তারা, ছায়াপথ ও ধূমকেতু ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তু এবং অতিনবতারা বিস্ফোরণ, গামা রশ্মি বিচ্ছুরণ ও মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ প্রভৃতি ঘটনাবলি এবং সেগুলির বিবর্তনের ধারাটিকে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূগোল এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়। সাধারণভাবে বললে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে ঘটা সকল ঘটনাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। ভৌত বিশ্বতত্ত্ব নামে আরেকটি পৃথক শাখাও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গেই সম্পর্কিত। এই শাখায় সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করা হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাচীনতম শাখাগুলির অন্যতম। লিপিবদ্ধ ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, গ্রিক, ভারতীয়, মিশরীয়, নুবিয়ান, ইরানি, চিনা, মায়া ও বেশ কয়েকটি আমেরিকান আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্যোতির্মিতি, সেলেস্টিয়াল নেভিগেশন, পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পঞ্জিকা প্রণয়নের মতো নানা রকম বিষয় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্তর্গত। তবে আজকাল পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানকে প্রায়শই জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের সমার্থক মনে করা হয়।

পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞান দু'টি উপশাখায় বিভক্ত: পর্যবেক্ষণমূলক ও তাত্ত্বিক। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তুগুলিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেই সব তথ্য পদার্থবিজ্ঞানের মূল সূত্র অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজ। অন্যদিকে তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই সব বস্তু ও মহাজাগতিক ঘটনাগুলি বর্ণনার জন্য কম্পিউটার বা অন্যান্য বিশ্লেষণধর্মী মডেল তৈরির কাজ করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই দু'টি ক্ষেত্র পরস্পরের সম্পূরক। তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলির ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে। অন্যদিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাত্ত্বিক ফলাফলগুলির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

বিজ্ঞানের অল্প কয়েকটি শাখায় এখনও অপেশাদারেরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান এই শাখাগুলির অন্যতম। মূলত অস্থায়ী ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নতুন ধূমকেতু আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

নাক্ষত্রিক জ্যোতির্বিদ্যা

****

মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতার জন্য নক্ষত্র এবং বড় বড় বিবর্তনের বিষয় নিয়ে গবেষণা মৌলিক। পর্যবেক্ষণ, তাত্ত্বিক বোধগম্যতা এবং অভ্যন্তর ভাগের কম্পিউটার সিমুলেশন থেকে তারকাগুলির জ্যোতিঃপদার্থ নির্ধারণ করা হয়েছে। চন্দ্র গঠন ধুলো এবং গ্যাসের ঘন অঞ্চলে ঘটে যা দৈত্য আণবিক মেঘ হিসাবে পরিচিত। যখন অস্থিতিশীল হয়ে যায় তখন ক্লাউড টুকরা মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবের কারণে একটি প্রোটোস্টার গঠন করতে পারে। যথেষ্ট ঘন, এবং গরম কোর অঞ্চল নিউক্লিয়ার ফিউশন বৃদ্ধি করবে, এইভাবে একটি প্রধান-ধারার তারকা তৈরি করবে। প্রায় সব উপাদান যা হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের তুলনায় ভারী তারা নক্ষত্রগুলির কোর অঞ্চলে তৈরি হয়েছিল।

ফলপ্রসূ উপাদানের বৈশিষ্ট্য মূলত তার ভরের শুরুর উপর নির্ভর করে। আরও বৃহৎ তারকা যার উজ্জ্বলতা আরও ব্যাপক, এবং আরও দ্রুতভাবে তার হাইড্রোজেন জ্বালানি তার হিলিয়ামের মধ্যে সঞ্চালন করে। সময়ের সাথে সাথে এই হাইড্রোজেন জ্বালানি সম্পূর্ণ হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং তারকাটি বিবর্তিত হতে শুরু করে। হিলিয়াম এর ফিউশনের জন্য উচ্চ কোর তাপমাত্রার প্রয়োজন। একটি তারকা খুব বেশি তাপমাত্রার সঙ্গে বাইরের স্তরে ধাক্কা দিবে তার ফলে এর কোরের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। হিলিয়ামের জ্বালানীটি হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার আগে বাইরের স্তরের দ্বারা গঠিত লাল দৈত্যটি একটি সংক্ষিপ্ত জীবনযাত্রা উপভোগ করে। খুব বড় বড় তারা বিবর্তনীয় পর্যায়েও আসতে পারে কারণ তারা ক্রমবর্ধমান ভারী উপাদানগুলিকে ফিউজ করে।

সূর্যের চূড়ান্ত ভাগ্য তার ভরের উপর নির্ভর করে, সূর্যের মূল কোর সুপারনোভার চেয়ে আট গুন বড় হয়; যখন ছোট তারা তাদের বাহ্যিক স্তরগুলিকে উড়িয়ে দেয় এবং একটি সাদা রঙের বামন তারার আকারে নিষ্ক্রিয় কোরের পিছনে চলে যায়। বাইরের স্তরের নিক্ষেপ একটি গ্রহের নিবোলা গঠন করে। একটি সুপারনোভার অবশিষ্টাংশ হল একটি ঘন নিউট্রন স্টার, অথবা, তারা কমপক্ষে তিন গুন বড় হতে পারে সূর্য থেকে, একে বলা কালপুরুষ। কাছাকাছি ঘূর্ণায়মান বাইনারি তারাগুলি আরও জটিল বিবর্তনীয় পথ অনুসরণ করতে পারে, যেমন একটি সাদা বামন সহচরের উপর ভর স্থানান্তর যা সম্ভাব্য একটি সুপারনোভা সৃষ্টি করতে পারে। গ্রহের নিবোলা এবং সুপারনোভা ফিউশন সংমিশ্রণে উৎপাদিত “ধাতু” বিতরণ করে; তাদের ছাড়া, সব নতুন তারা (এবং তাদের গ্রহের সিস্টেম) হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম থেকে গঠিত হবে।

সৃষ্টি

***

হিন্দু পুরাণে একাধিক উপায়ে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।ঋগ্বেদের অন্যতম প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী (১০.১২১) সৃষ্টির প্রকাশ হয়েছিল হিরণ্যগর্ভ নামক এক মহাজাগতিক অণ্ড তথা ডিম থেকে।

পুরুষসূক্তের (১০.৯০) মতে, দেবতাদের দ্বারা পরাজিত পুরুষ নামক এক অলৌকিক মানবের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নানা বস্তুর সৃষ্টি। পুরাণ অনুসারে, বরাহরূপী বিষ্ণু কল্পের জল থেকে পৃথিবী বা ভূমিকে উদ্ধার করেছিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে লেখা আছে, সৃষ্টিকর্তা তথা পরমপিতা প্রজাপতি সৃষ্টির আদিতে সম্পূর্ণ একলা ছিলেন। তাই তিনি নিজেকে পুরুষ ও স্ত্রী-রূপী দুটি খণ্ডে বিভক্ত করেন। স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটি প্রাণীর দুই ভিন্ন প্রজাতি তৈরী করলেন। পরে এই প্রজাপতিকেই পুরাণে ব্রহ্মা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরাণে বলা আছে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্তা মহেশ্বরের (শিব) সাথে যুক্ত হয়ে এক ত্রিমূর্তি গঠন করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন ব্রহ্মা, তা পালন করেন বিষ্ণু এবং পরবর্তী সৃষ্টির জন্য বর্তমান সৃষ্টিকে ধ্বংস করেন শিব। আবার কিছু গল্পে দেখা যায়, ব্রহ্মাও বিষ্ণু থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। কল্পের সাগরে শেষনাগের অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর নাভি থেকে জাত পদ্মের ওপরে ব্রহ্মাকে বসে থাকতে দেখা যায়। সৃষ্টির আদিতে বিষ্ণুই একা ছিলেন, সৃষ্টির কথা স্মরণ হতেই তাঁর নাভিজাত পদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়।

হিন্দুধর্মে চোদ্দটি লোক বা জগতের কথা বলা হয়েছে–৭টি ঊর্ধ্বলোক এবং ৭টি নিম্নলোক (পৃথিবী রয়েছে ঊর্ধ্বলোকগুলির সবচেয়ে নিচে)। ঊর্ধ্বলোকগুলি হল–ভূ (ভূমি), ভূবঃ (বায়ু), স্ব (স্বর্গ), মহঃ, জন, তপ ও সত্য। সত্যলোকে ব্রহ্মার বাস, মহঃ লোকে ঋষিগণের বাস এবং স্বর্গে বাস দেবতাদের। নিম্নলোকগুলি হল–অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল।

প্রতিটি লোকই হল (পৃথিবী বাদে) মৃত্যুর পর আত্মার অস্থায়ী বাসস্থান। মতান্তরে মৃত্যুর পরে সব আত্মার বাসস্থান চাঁদের উল্টোদিকে। শুধুমাত্র পিতৃপক্ষের সময়ে চাঁদের যে দিক অন্ধকার সেটা ঘোরে আলোর দিকে আর মহাজাগতিক টানে আত্মারা নেমে আসে পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ টানে কিন্তু বায়বীয় হবার জন্য আশ্রয় নেয় জলে, অন্ধকার স্থানে, গাছের মধ্যে। সেই সময় তাঁরা আশা করেন তাদের উত্তরসূরীরা তাঁদের জন্য একটু জল রাখবে, প্রদীপ জ্বালবে পথ আলোকিত করতে, পেলে তাঁরা আশীর্বাদ করেন আর না পেলে দুঃখিত হন।

পৃথিবীতে জীবের মৃত্যুর পর ধর্মরাজ যম জীবের সমস্ত পাপ-পুণ্যের বিচার করে তাকে ঊর্ধ্ব কিংবা নিম্নলোকে পাঠান। ধর্মের কিছু শাখায় বলা আছে, পাপ ও পুণ্য পরস্পরকে প্রশমিত করতে পারে, তাই পরবর্তী জন্ম স্বর্গ বা পাতালে হতেই পারে। আবার কোথাও বলা হয়েছে, পাপ ও পুণ্য একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে আত্মা উপযুক্ত লোকটিতে জন্ম নেয়। তারপর ওই লোকে আত্মার জীবনকাল শেষ হলে তা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে (পৃথিবীর কোনো এক জীব রূপে জন্ম নেয়)। বলা হয়, একমাত্র পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই আত্মার মোক্ষলাভ বা পরমধামে যাত্রা হতে পারে, যে স্থান জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত, যেখানে রয়েছে স্বর্গীয় পরমানন্দ।

এবারে আসবো জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে সাতাশটি নক্ষত্রের কথা আছে তাদের কথায়। সেখানেও বহু পৌরাণিক কাহিনী জড়িয়ে আছে।

জ্যোতিষে মানুষের জীবনে নক্ষত্রের ভূমিকা:

****

ছয়টি বেদাঙ্গের একটি জ্যোতিষ। প্রাচীনকালে জ্যোতিষ অনুসারে শুভ তিথি- যজ্ঞ করা হত। জ্যোতি অর্থ আলো। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র দীপ্তিমান অর্থাৎ এদের জ্যোতি বা আলো রয়েছে। মানব-জীবনে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সংক্রান্ত জ্ঞান বা বিদ্যাই জ্যোতিষ বিজ্ঞান। ভৃগু, পরাশর, জৈমিনি আদি প্রাচীন ঋষিগণকে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের প্রবর্তক বলা চলে।

তাঁরা জ্যোতিষবিদ্যা বিভিন্ন অঙ্গ বা শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, পৃথিবীর নিকটবর্তী নয়টি গ্রহ, বারটি রাশি ও সাতাশটি নক্ষত্র মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাবই জ্যোতিষ বিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। জাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় এসব গ্রহ, রাশি ও নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে জাতকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। নিচে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল।

গ্রহ পরিচয়

******

জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলে গ্রহগণ নিছক জড় বস্ত্ত নয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহগণকে দেবতা জ্ঞান করা করেছে। গ্রহগণ সর্বদা ঘুর্ণায়মান। প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন গ্রহ দ্বারা প্রভাবিত। গ্রহগণ ঘুরতে ঘুরতে যখন শুভ অবস্থানে থাকে তখন জাতকের শুভ হয় এবং গ্রহগণ যখন অশুভ অবস্থানে থাকে তখন জাতকের অশুভ হয়। নবগ্রহের নাম- ১) রবি, ২) সোম, ৩) মঙ্গল, ৪) বুধ, ৫) বৃহস্পতি, ৬) শুক্র, ৭) শনি, ৮) রাহু ও ৯) কেতু। এই নবগ্রহের মধ্যে সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই চারটি গ্রহ অধিকাংশ সময় শুভফল প্রদান করে বলে এদেরকে শুভ গ্রহ এবং রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতু এই পাঁচটি গ্রহ অধিকাংশ সময় অশুভফল প্রদান করে বলে এদেরকে অশুভ গ্রহ বা পাপ গ্রহ বলে। নবগ্রহের রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি পুরুষ, চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রী এবং বুধ ও শনি ক্লীব বা নপুংসক। রবি একটি রাশিতে ত্রিশ দিন, চন্দ্র সোয়া দুই দিন, মঙ্গল পয়তাল্লিশ দিন, বুধ আঠার দিন, বৃহস্পতি এক বছর, শুক্র আটাশ দিন, শনি আড়াই বছর এবং রাহু-কেতু দেড় বছর অবস্থান করে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে গ্রহদের কারকতা

****

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে :
রবি: আত্মা, পিতা, রক্ত বর্ণ, কটু (ঝাল) রস, পিত্ত ধাতু, স্বভাব, যশ-খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কারক।
চন্দ্র: মন, মাতা, জল, শুভ্রবর্ণ, লবণ রস, শ্লেষ্মা ধাতু, চঞ্চলতা, চিন্তাশক্তি, সাহিত্য প্রভৃতির কারক।

মঙ্গল: শক্তি, ভ্রাতৃ, ভূমি, সম্পত্তি, সাহস, পরাক্রম, অগ্নি, লাল বর্ণ, তিক্ত রস, পিত্ত ধাতু প্রভৃতির কারক।
বুধ: বুদ্ধি, মাতুল, বাণিজ্য, বাক্-শক্তি, মিশ্র রস, সম ধাতু, হাস্য, শিল্প, সাহিত্য, সবুজ বর্ণ প্রভৃতির কারক।
বৃহস্পতি : ধর্ম, পুত্র, ধন, জ্ঞান, মিষ্টি রস, কফ ধাতু, হলুদ বর্ণ প্রভৃতির কারক।
শুক্র: প্রেম, কাম, স্ত্রী, সুখ, অম্ল রস, কফ ধাতু, গীত, কাব্য, শুভ্র বর্ণ প্রভৃতির কারক।
শনি: দুঃখ, মৃত্যু, বিপদ, কষায় রস, বায়ু ধাতু, অস্ত্র, আধ্যাত্মিকতা, গুপ্তবিদ্যা প্রভৃতির কারক নীল বর্ণ প্রভৃতির কারক।
রাহু: শত্রু, নিদ্রা, চৌর্য, বিষক্রিয়া, পিতামহ, দ্যুত-ক্রিড়া, বায়ু ধাতু, কাল বর্ণ প্রভৃতির কারক।
কেতু মাতামহ, সর্প, দংশন, ক্ষুধা, ধুম্র বর্ণ, ব্রণ ও চর্ম রোগ প্রভৃতির কারক।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে গ্রহদের শত্রু-মিত্র ও গ্রহ-দৃষ্টি কথন

****

জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলে গ্রহদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা-মিত্রতা রয়েছে।
রবির মিত্র- চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি, শত্রু- শুক্র ও শনি এবং সম- বুধ।
চন্দ্রের মিত্র- রবি ও বুধ, শত্রু- নেই এবং সম- মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি।
মঙ্গলের মিত্র- রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি, শত্রু- বুধ এবং সম- শুক্র ও শনি।
বুধের মিত্র- রবি ও শুক্র, শত্রু- চন্দ্র এবং সম- শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি।
বৃহস্পতির মিত্র- রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল, শত্রু- বুধ ও শুক্র এবং সম- শনি।
শুক্রের মিত্র- বুধ ও শনি, শত্রু- রবি ও চন্দ্র এবং সম- মঙ্গল ও বৃহস্পতি।
শনির মিত্র- বুধ ও শুক্র, শত্রু- রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল এবং সম- বৃহস্পতি।
রাহুর মিত্র- শুক্র ও শনি, শত্রু- রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল এবং সম- বুধ ও বৃহস্পতি।
কেতুর মিত্র- রবি ও চন্দ্র, শত্রু- শুক্র ও শনি এবং সম- বুধ ও বৃহস্পতি।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে গ্রহশুদ্ধি

««««««««««««««««««««««««««««

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে বারটি নক্ষত্রপুঞ্জ বা রাশি মহাকাশে বৃত্তাকারে অবস্থান করছে। একটি বৃত্তের মোট ৩৬০ অংশ ধরা হয়। তাহলে বারটি রাশির জন্য ৩৬০ অংশ থাকলে প্রত্যেকটি রাশির জন্য ৩৬০/১২=৩০ অংশ থাকে। বারটি রাশির জন্য ৩০ অংশ করে ১২টি স্থান রয়েছে। নয়টি গ্রহ তাদের নিজ নিজ গতিতে নির্দিষ্ট সময়ে একটি রাশির ৩০ অংশ স্থান অতিক্রম করে পরের রাশির স্থানে গমন করে এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে বারটি রাশির স্থান ভ্রমণ করে। অংশেরও ক্ষুদ্র ভাগ আছে যথা-৬০ বিকলায় ১ কলা, ৬০ কলায় ১ অংশ এবং ৩০ অংশে এক রাশি। গ্রহগণ ১২টি রাশির ১২টি স্থানেই শুভফল দেয় না। যেমন চন্দ্র ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১০ম ও ১১শ স্থানে থাকলে শুদ্ধ হয় এবং শুভ ফল প্রদান করে। যেমন কর্কট রাশির ক্ষেত্রে কর্কট (১ম), কন্যা (৩য়), ধনু (৬ষ্ঠ), মকর (৭ম), মেষ (১০ম) ও বৃষে (১১শ) চন্দ্র অবস্থানের সময় চন্দ্র-শুদ্ধি হয়। তবে শুক্লপক্ষে চন্দ্র ২য়, ৫ম ও ৯ম স্থানেও শুভ

ফল প্রদান করে। রবি জন্মরাশি হতে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১১শ স্থানে থাকলে শুদ্ধ হয়। চন্দ্রশুদ্ধি ও রবিশুদ্ধি থাকলে অন্যান্য গ্রহের অশুভ ফল হ্রাস পায়। শনি, মঙ্গল, রাহু ও কেতু প্রত্যেকে জন্ম রাশি হতে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১১শ স্থানে থাকলে শুদ্ধ হয়। বৃহস্পতি জন্ম রাশি হতে ২য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম ও ১১শ স্থানে থাকলে শুদ্ধ হয়। বুধ জন্ম রাশি হতে ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ স্থানে থাকলে শুদ্ধ হয়। একাদশ স্থান একটি বিশেষ স্থান যেখানে সব গ্রহই শুভ ফল প্রদান করে। মেষ রাশির প্রথমে, বৃষ রাশির পঞ্চমে, মিথুন রাশির নবমে, কর্কট রাশির দ্বিতীয়ে, সিংহ রাশির ষষ্ঠে, কন্যা রাশির দশমে, তুলা রাশির তৃতীয়ে, বৃশ্চিক রাশির সপ্তমে, ধনু রাশির চতুর্থে, মকর রাশির অষ্টমে, কুম্ভ রাশির একাদশে এবং মীন রাশির দ্বাদশে চন্দ্র অবস্থান করলে ঘাত-চন্দ্র হয়। ঘাত-চন্দ্রে যাত্রা ও বিবাহ অশুভ।

রাশি পরিচয়

«««««««««««««««

পৃথিবীর চতুর্দিকে যে দ্বাদশ সংখ্যক নক্ষত্রপুঞ্জ বা নক্ষত্ররাশি রয়েছে তা সংক্ষেপে রাশি নামে পরিচিত। পৃথিবী থেকে যে নক্ষত্র-রাশিকে যেমন দেখা যায় ঐ নক্ষত্ররাশিকে তেমন নাম দেয়া হয়েছে। যেমন-পৃথিবী থেকে যে নক্ষত্ররাশিকে মেষ বা ভেড়ার মত মনে হয় সে নক্ষত্ররাশির নাম ‘মেষ’ রাখা হয়েছে। একইভাবে অন্যান্য রাশিগুলোরও নামকরণ করা হয়েছে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত বারটি রাশির নাম-
১) মেষ, ২) বৃষ, ৩) মিথুন, ৪) কর্কট, ৫) সিংহ, ৬) কন্যা, ৭) তুলা, ৮) বৃশ্চিক, ৯) ধনু, ১০) মকর, ১১) কুম্ভ ক্রূর ও ১২) মীন। মেষ- ক্রূর, বিষম, চর (গতিশীল) ও হ্রস,
বৃষ- সৌম্য, সম, স্থির ও হ্রস,
মিথুন- ক্রূর, বিষম ও দ্ব্যাত্মক,
কর্কট- সৌম্য, সম ও চর,
সিংহ- ক্রূর, বিষম, স্থির ও দীর্ঘ,
কন্যা- সৌম্য, সম, দ্ব্যাত্মক ও দীর্ঘ,
তুলা- ক্রূর, বিষম, চর ও দীর্ঘ,
বৃশ্চিক- সৌম্য, সম, স্থির ও দীর্ঘ,
ধনু- ক্রূর, বিষম ও দ্ব্যাত্মক,
মকর- সৌম্য, সম ও চর,
কুম্ভ- ক্রূর, বিষম, স্থির ও হ্রস এবং
মীন- সৌম্য, সম, দ্ব্যাত্মক ও হ্রস।
বারটি রাশির মধ্যে মেষ, সিংহ ও ধনুকে অগ্নি রাশি,
বৃষ, কন্যা ও মকরকে পৃথ্বী রাশি,
মিথুন, তুলা ও কুম্ভকে বায়ু রাশি এবং
কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনকে জল রাশি বলে।

মেষ রাশির নামের আদ্যার- অ এবং ল,
বৃষ রাশির নামের আদ্যাক্ষর-ই, উ এবং ব,
মিথুন রাশির নামের আদ্যাক্ষর- ক, ছ, ঘ এবং ঙ,
কর্কট রাশির নামের আদ্যাক্ষর- ড এবং হ,
সিংহ রাশির নামের আদ্যাক্ষর- ম এবং ট,
কন্যা রাশির নামের আদ্যাক্ষর- প, থ, ষ এবং ণ,
তুলা রাশির নামের আদ্যাক্ষর- র এবং ত,
বৃশ্চিক রাশির নামের আদ্যাক্ষর- ন এবং য,
ধনু রাশির নামের আদ্যাক্ষর- ধ এবং ভ,
মকর রাশির নামের আদ্যাক্ষর- খ এবং জ,
কুম্ভ রাশির নামের আদ্যাক্ষর- গ এবং শ এবং
মীন রাশির নামের আদ্যাক্ষর- দ এবং চ।

রবি, চন্দ্র আদি নয়টি গ্রহ এই বারটি রাশিতে পর্যায়ক্রমে ভ্রমণ করে। নয়টি গ্রহের মধ্যে সাতটি গ্রহ আবার বারটি রাশির অধিপতি।

রবি সিংহ রাশির, চন্দ্র কর্কট রাশির, মঙ্গল মেষ ও বৃশ্চিক রাশির, বুধ মিথুন ও কন্যা রাশির, বৃহস্পতি ধনু ও মীন রাশির, শুক্র বৃষ ও তুলা রাশির এবং শনি মকর ও কুম্ভ রাশির অধিপতি।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে জন্ম রাশি ফল

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার চন্দ্র যে রাশিতে থাকে ঐ রাশিকে জন্ম-রাশি বলে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে,
মেষ রাশির জাতক: ভাবপ্রবণ, চঞ্চল, জেদী, ক্রোধী, সামান্য কারণে আনন্দিত বা বিষাদগ্রস্ত, মিষ্টান্নপ্রিয়, ত্যাগী, ধনী, নিজ কর্মে বিশ্বাসী, প্রবল আত্মবোধ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির অধিকারী।

বৃষ রাশির জাতক: স্থুল নেত্রযুক্ত, স্বল্পভাষী, ধীর-স্থীর, ধার্মিক, কুলজনের হিতকারী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিযুক্ত, অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী, স্থির-প্রতিজ্ঞ, বাস্তববাদী, আধিপত্য বিস্তারকারী ও হিসাবী।

মিথুন রাশির জাতক: ধীর-গতিসম্পন্ন, স্পষ্টবাক, পরহিতৈষী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিযুক্ত, পণ্ডিত, হাস্যযুক্ত, কৌতুকপ্রিয়, আত্ম-প্রশংসাকামী, সমালোচক, গীতবাদ্য অনুরাগী।

কর্কট রাশির জাতক: চিন্তাশীল, ভাবুক, কল্পনাপ্রবন, উদার, সত্যবাদী, দয়ালু, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, পণ্ডিত, প্রগতিশীল হলেও পুরাতনপন্থী, দৃঢ়-প্রতীজ্ঞ, ভ্রমণপ্রিয়, আশ্চর্যজনক বিষয়ে আগ্রহশীল, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং সাহিত্য ও গীতবাদ্যে অনুরাগী।

সিংহ রাশির জাতক: বিশ্বাসী, ক্রোধী, বন্ধুহীন, উন্নত-বক্ষবিশিষ্ট, খেয়ালী, কর্তৃত্বপ্রিয়, স্বাধীনচেতা, বিলাসী, স্পষ্টবক্তা, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারী, আত্ম-সচেতন ও অমিতব্যয়ী।

কন্যা রাশির জাতক: ধার্মিক, বালক-স্বভাবযুক্ত, ক্ষমাপরায়ণ, একমনা, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিযুক্ত, সমালোচক, সৎ হলেও ক্ষেত্র বিশেষে কুটিল-স্বভাবযুক্ত, মাতৃভক্ত, সাহিত্য-রসিক এবং রমণীগণের প্রিয়।
তুলা রাশির জাতক: কোমল শরীর-বিশিষ্ট, দাতা, বন্ধুবৎসল, সদালাপী, অতিভাষী, দৈব-প্রভাবযুক্ত, বুদ্ধিমান, সামাজিক, ভোগী, বিলাসী, শাস্ত্রজ্ঞ, সঙ্গীতজ্ঞ ও রমণীগণের প্রিয়।

বৃশ্চিক রাশির জাতক: পণ্ডিত, দৃঢ়মতি, বলশালী, আত্মনির্ভরশীল, কর্মদক্ষ, গম্ভীর, জেদী, ক্রোধী, পরমত অসহিষ্ণু, সর্বদা উদ্বেগযুক্ত ও খলবুদ্ধিসম্পন্ন।

ধনু রাশির জাতক: নানা কীর্তিপরায়ণ, কুলগৌরবযুক্ত, বন্ধুলোকের হিতকামী, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রভূত ধন-সম্পদযুক্ত, ধীর গতিসম্পন্ন, ধার্মিক, স্বাধীনচেতা, উচ্চাভিলাসী, কর্তৃত্বপ্রিয়, অহংকারী, ক্ষণক্রোধী, পিতৃধন ত্যাগী, গীতপ্রিয়, মিতব্যয়ী, কখনও ধীর আবার কখনও স্থির, দ্বিধাভাবগ্রস্ত ও সন্দিগ্ধমনা।

মকর রাশির জাতক:তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিযুক্ত, ধীর, আত্মাভিমানী, পরাক্রমযুক্ত, বন্ধুবৎসল, দ্বায়িত্বসম্পন্ন, ভোগবিলাসী, মন্ত্রণা ও বাদানুবাদে দক্ষ, সুনামপ্রিয়, পরদারাসক্ত এবং বাইরে থেকে সহজ-সরল মনে হলেও অন্তরে কুটিল।

কুম্ভ রাশির জাতক: উদ্যমী, একাগ্র চিত্তের অধিকারী, ভাবুক, ধার্মিক, নির্জনতাপ্রিয়, সংস্কারপ্রিয়, জ্ঞাতিবর্গসহ আমোদকারী, পরদারাসক্ত, ধনশালী, গম্ভীর, কুটিল স্বভাবযুক্ত ও নিদ্রাপ্রিয়।

মীন রাশির জাতক: ধৈর্যশালী, সাহিত্যপ্রিয়, একাগ্র, জ্ঞানী, মানী, আশাবাদী, উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন, উদার, ধার্মিক, দ্বিধাভাবগ্রস্ত, স্ত্রী-জয়ী, রমণীপ্রিয়, সাহিত্যরসিক ও ধনেজনে সুখভোগী।

॥চতুর্থ পর্ব॥

লগ্ন পরিচয়:

এক দিবারাত্রের মধ্যে বারটি রাশি পর্যায়ক্রমে পূর্বদিকে উদিত হয়। রাশিসমূহের এই উদয়কালকে লগ্ন বলে। লগ্নকে অন্যভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায়। পৃথিবী নিজ কক্ষপথে ভ্রমণের সময় এক দিনে এর চতুর্দিকে অবস্থিত ১২টি রাশির প্রত্যেকটিকে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে অতিক্রম করে ঐ নির্দিষ্ট সময়কে লগ্ন বলে। পৃথিবী যে সময় ব্যাপী যে রাশি অতিক্রম করে ঐ রাশির নাম অনুসারে ঐ লগ্নের নাম হয়। যেমন সূর্যোদয়ের পর দুই ঘণ্টা পর্যমত্ম যদি পৃথিবী মেষ রাশিকে অতিক্রম করতে থাকে তাহলে ঐ সময়কে বলা হবে মেষ লগ্ন এবং সূর্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পর বৃষ লগ্ন শুরম্ন হবে। এভাবে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় পর পর বারটি লগ্ন আবর্তিত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত বারটি লগ্নের নাম- ১) মেষ, ২) বৃষ, ৩) মিথুন, ৪) কর্কট, ৫) সিংহ, ৬) কন্যা, ৭) তুলা, ৮) ধনু, ৯) বৃশ্চিক, ১০) মকর, ১১) কুম্ভ ও ১২) মীন।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে জন্ম-লগ্ন ফল:

জন্মের সময় পৃথিবীর নিকটস্থ রাশিকে অর্থাৎ পৃথিবী যে রাশিকে অতিক্রম করছিল সে রাশিকে জন্ম-লগ্ন বলে। এখন সংক্ষিপ্তাকারে দ্বাদশ প্রকার জন্ম-লগ্নের ফল দেয়া যাক। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, মেষ লগ্নের জাতক যশস্বী, মানী, পরবৎসল, জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, সাহসী, ক্রোধী, কুটচিন্তাশীল, ভোগী ও স্ত্রীপুত্র সুখে সুখী হয়ে থাকে।

বৃষ লগ্নের জাতক গুরুভক্ত, প্রিয়ভাষী, গুণবান, কৃতী, তেজস্বী, সর্বজনপ্রিয়, সুরতক্রিয়া নিপুন, লোভী ও পরস্ত্রীতে অনুরক্ত হয়ে থাকে।

মিথুন লগ্নের জাতক মান্যগণ্য, যশস্বী, শিক্ষিত, আত্মীয়বৎসল, ত্যাগী, ভোগী, ধনী, কামী, দীর্ঘসূত্রী, সাহিত্যরসিক, সঙ্গীতজ্ঞ, সুবক্তা হয়ে থাকে।

কর্কট লগ্নের জাতক সর্বজনপ্রিয়, স্বজনপ্রিয়, ধার্মিক, ধনী, ভোগী, পণ্ডিত, ভাষাবিদ, জনসেবক এবং মিষ্টান্ন ও পানীয় দ্রব্যপ্রিয় হয়ে থাকে।

সিংহ লগ্নের জাতক শত্রুজয়ী, বুদ্ধিমান, উৎসাহী, বলশালী, পরদ্রব্যভোগী, ক্রোধী, স্বল্পপুত্রবিশিষ্ট, জনপ্রিয় ও স্বার্থহীন হয়ে থাকে।

কন্যা লগ্নের জাতক ধার্মিক, জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ, বিচক্ষণ, অহংকারী, পর্যটক, বক্তা, কামকলাপ্রিয়, সৌভাগ্যশালী ও স্বল্পাহারী হয়ে থাকে।

তুলা লগ্নের জাতক ধীর-স্থির, বহুজনের হিতকারী, বিদ্বান, সৎকর্মে অনুরক্ত, ধনী, মানী, শিল্পকলায় পরিদর্শী ও অল্পভোগী হয়ে থাকে।

বৃশ্চিক লগ্নের জাতক শৌর্যশালী, বুদ্ধিমান, সৌভাগ্যযুক্ত, ক্রোধী, কামুক, সাহসী, ক্ষুধাতুর, বিবাদকারী ও দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত হয়ে থাকে।

ধনু লগ্নের জাতক নীতিপরায়ণ, ধার্মিক, শাণিতবাক, বিদ্বান, ধনী, সুখী, জ্ঞানী, বহুলোকের হিতকারী, চাপা-স্বভাব, অহংকারী ও উচ্চাভিলাসী হয়ে থাকে।

মকর লগ্নের জাতক যশস্বী, ধনী, বহুসন্তানযুক্ত, কপট, কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু, লোভী, হীনকর্মযুক্ত ও স্বকার্যে তৎপর হয়ে থাকে।
কুম্ভ লগ্নের জাতক বলশালী, সুখী, বন্ধুযুক্ত, বেদজ্ঞ, সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, তপস্বী, ক্রোধী, চঞ্চল, পরস্ত্রীতে আসক্ত ও নিদ্রালু হয়ে থাকে।

মীন লগ্নের জাতক অতিশয় জ্ঞানী, দেবতা ও গুরু-পূজক, মানী, ধনী, স্পর্শকাতর, নিঃসঙ্গ জীবনীশক্তিযুক্ত, স্বল্প রোমবিশিষ্ট ও বহুকাল পরীক্ষাকারী হয়ে থাকে।

তিথি পরিচয়:

জ্যোতিষ বিজ্ঞান মতে চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে ত্রিশ দিন লাগে। চন্দ্র ও পৃথিবী ঘুর্ণনের ফলে চন্দ্র ক্রমশ দৃশ্যমান হতে হতে পনের দিনে সম্পূর্ণ দৃশ্যমান হয় যাকে পূর্ণিমা বলে এবং পরবর্তী পনের দিন পর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় যাকে অমাবস্যা বলে। যে একক সময়ে চন্দ্রের এরকম হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাকে প্রতিপদ, দ্বিতীয়া আদি তিথি বলে। অমাবস্যার পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পনের দিন শুক্ল পক্ষ এবং পূর্ণিমার পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে অমাবশ্যা পর্যমত্ম পনের দিন কৃষ্ণ পক্ষ নামে পরিচিত। শুক্ল পক্ষের তিথির নাম- ১) প্রতিপদ, ২) দ্বিতীয়া, ৩) তৃতীয়া, ৪) চতুর্থী, ৫) পঞ্চমী, ৬) ষষ্ঠী, ৭) সপ্তমী, ৮) অষ্টমী, ৯) নবমী, ১০) দশমী, ১১) একাদশী, ১২) দ্বাদশী, ১৩) ত্রয়োদশী, ১৪) চতুর্দশী ও ১৫) পূর্ণিমা। কৃষ্ণ পক্ষের তিথির নাম- ১৬) প্রতিপদ, ১৭) দ্বিতীয়া, ১৮) তৃতীয়া, ১৯) চতুর্থী, ২০) পঞ্চমী, ২১) ষষ্ঠী, ২২) সপ্তমী, ২৩) অষ্টমী, ২৪) নবমী, ২৫) দশমী, ২৬) একাদশী, ২৭) দ্বাদশী, ২৮) ত্রয়োদশী, ২৯) চতুর্দশী ও ৩০) অমাবস্যা।
তিথিসমূহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা- নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা। প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশীকে নন্দা; দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশীকে ভদ্রা; তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশীকে জয়া; চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশীকে রিক্তা এবং পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাকে পূর্ণা বলে।

চন্দ্রাষ্টমা কি?

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, চন্দ্রাষ্টমা এমন একটি দিনকে নির্দেশ করে যখন চাঁদ আপনার চন্দ্র রাশি থেকে ৪ম ঘরে স্থানান্তর করে। ‘চন্দ্রাষ্টমা’ শব্দটি দুটি শব্দ থেকে এসেছে-‘চন্দ্র’ অর্থ চাঁদ এবং ‘অষ্ট’ অর্থ আট। একটি

চন্দ্র রাশি থেকে অন্য চন্দ্র রাশিতে যেতে চন্দ্রের আড়াই দিন সময় লাগে তাই এই সময়টিকে নির্দিষ্ট চন্দ্র রাশির অধিবাসীদের কাছে চন্দ্রাষ্টমা বলা হয়। চন্দ্রাষ্টমার দিনগুলি সাধারণত কোনও কাজ শুরু করার জন্য অশুভ বলে মনে করা হয়।

চন্দ্রাষ্টমার তাৎপর্য চাঁদ আপনার মনের উপর প্রধান অভিব্যক্তি এবং ফ্রিকোয়েন্সি প্রয়োগ করে এবং চন্দ্রাষ্টমার দিনে অজ্ঞানভাবে প্রভাবিত করে। চন্দ্রাষ্টমার সময় সাধারণ প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তি, সিদ্ধান্তহীনতা, অনুপস্থিত মানসিকতা, বিষণ্ণতা এবং ভয়। যেহেতু চাঁদ সকলের মন এবং চিন্তার একটি প্রধান সূচক হিসাবে কাজ করে, এই ট্রানজিটের সময়, আপনি আপনার সত্যিকারের সম্ভাব্যতা পূরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারেন। তাই, 2-1/2 দিনের মানে আড়াই দিনের এই সময়টি কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রতিকূল বলে বিবেচিত হয়। এই সময়ে আপনি প্রার্থনা, মন্ত্র জপ এবং দাতব্য সহ আধ্যাত্মিক অনুশীলনে জড়িত হতে পারেন। পরিবার, সম্পর্ক, ব্যবসা এবং লেনদেন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। আপনি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা এবং প্রার্থনা সম্পাদন করে চন্দ্রাষ্টমার কুপ্রভাব মোকাবেলা করতে পারেন।

নিজের চন্দ্রাষ্টমা দিনগুলি জানা থাকলে নিজে চন্দ্রাষ্টমার দিনগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজের কার্যকলাপ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে, সংযমী হতে বাক্যে ও কার্যে এবং কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়াতে সুবিধা দেয়। নিজের ভুলগুলি সনাক্ত এবং সংশোধন করার জন্য এটি স্ব-অধ্যয়ন এবং চিন্তাভাবনার জন্য সবচেয়ে অনুকূল সময়।

নক্ষত্র পরিচয়

মহাকাশে অগণিত নক্ষত্র রয়েছে। তার মধ্যে পৃথিবীর উপর সাতাশটি নক্ষত্রের প্রভাব বিদ্যমান। জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত সাতাশটি নক্ষত্রের নাম-
১) অশ্বিনী, ২) ভরণী, ৩) কৃত্তিকা, ৪) রোহিণী,
৫) মৃগশিরা, ৬) আর্দ্রা, ৭) পুনর্বসু, ৮) পুষ্যা,
৯) অশ্লেষা, ১০) মঘা, ১১) পূর্ব-ফাল্গুনী, ১২) উত্তর-ফাল্গুনী,
১৩) হস্তা, ১৪) চিত্রা, ১৫) স্বাতী, ১৬) বিশাখা,
১৭) অনুরাধা, ১৮) জ্যেষ্ঠা, ১৯) মূলা, ২০) পূর্বাষাঢ়া,
২১) উত্তরাষাঢ়া, ২২) শ্রবণা, ২৩) ধনিষ্ঠা, ২৪) শতভিষা,
২৫) পূর্ব-ভাদ্রপদ, ২৬) উত্তর-ভাদ্রপদ ও ২৭) রেবতী।

হিন্দু-পুরাণ মতে এই সাতাশটি নক্ষত্র কোন দীপ্তিমান জড় বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে এই সাতাশটি নক্ষত্র মূলত দক্ষের সাতাশ কন্যা। চন্দ্র এই সাতাশ কন্যাকে বিবাহ করেছেন। যা হোক, চন্দ্র পর্যায়ক্রমে একটি ন্ত্রে একদিন অবস্থান করেন। চন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য গ্রহগণও সাতাশটি নক্ষত্রকে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে অতিক্রম করেন। নক্ষত্রসমূহকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়েছে।

যেমন, উগ্রগণ- পূর্ব-ফাল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্ব-ভাদ্রপদ, মঘা ও ভরণী নক্ষত্র।
ধ্রুবগণ- উত্তর-ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর-ভাদ্রপদ ও রোহিণী নক্ষত্র।
চরগণ- স্বাতী, পুনর্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্র।
ক্ষিপ্রগণ- পুষ্যা, অশ্বিনী ও হস্তা নক্ষত্র।
মৃদুগণ- চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতী নক্ষত্র।
তীক্ষ্ণগণ- আর্দ্রা, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্র।
মিশ্রগণ- কৃত্তিকা ও বিশাখা।

নক্ষত্র সংশ্লিষ্ট যোগ

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে রবি বারে উত্তর-ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর-ভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, হস্তা, মূলা ও রেবতী; সোম বারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা, পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, পূর্ব-ভাদ্রপদ, উত্তর-ভাদ্রপদ, হসত্মা ও অশ্বিনী; মঙ্গল বারে পুষ্যা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, স্বাতী, উত্তর-ভাদ্রপদ ও রেবতী; বুধ বারে কৃত্তিকা, রোহিণী, অনুরাধা, শতভিষা; বৃহস্পতি বারে স্বাতী, পুনর্বসু, পুষ্যা ও অনুরাধা; শুক্র বারে পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, পূর্ব-ভাদ্রপদ, উত্তর-ভাদ্রপদ, অশ্বিনী, শ্রবণা ও অনুরাধা এবং শনি বারে স্বাতী ও রোহিণী নক্ষত্র হলে নক্ষত্রামৃত-যোগ হয়।

সিদ্ধি ও নক্ষত্রামৃত যোগ যদি একইদিনের যে কোন সময় মিলিত হয়, তবে তাকে বিষযোগ বলে। রবি ও মঙ্গল বারে নন্দা তিথি ও স্বাতী, শতভিষা, আর্দ্রা, রেবতী, চিত্রা, অশ্লেষা, মূলা ও কৃত্তিকা নক্ষত্র, শুক্র ও সোম বারে ভদ্রা তিথি ও পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, পূর্ব-ভাদ্রপদ ও উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্র, বুধ বারে জয়া তিথি ও মৃগশিরা, শ্রবণা, পুষ্যা, জ্যেষ্ঠা, অশ্বিনী, ভরণী ও অভিজিৎ নক্ষত্র, বৃহস্পতি বারে রিক্তা তিথি ও পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, বিশাখা, অনুরাধা, পুনর্বসু, মঘা, নক্ষত্র এবং শনি বারে পূর্ণা তিথি ও রোহিণী, হস্তা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হলে ত্র্যমৃতযোগ হয়।

রবি বারে অশ্বিনী, সোম বারে চিত্রা, মঙ্গল বারে উত্তরাষাঢ়া, বুধ বারে মূলা, বৃহস্পতি বারে শতভিষা, শুক্র বারে পুষ্যা এবং শনি বারে ভরণী নক্ষত্র হলে ক্রকচ-যোগ হয়।

নক্ষত্রের সংখ্যা সাতাশ ২৭টি। তার মধ্যে সাধারণত ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, পূর্বাষাঢ়া, পূর্ব ভাদ্রপদ, পূর্ব ফাল্গুনী,বিশাখা, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র শুভ কাজে বর্জনীয়। এর মধ্যে ভরণী বা কৃত্তিকা বিশেষ ভাবে বর্জনীয়।

• অন্নপ্রাশনে শুভ নক্ষত্র-অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুনর্বসু, ধনিষ্ঠা, পুষ্যান, হস্তা, স্বাতী, অনুরাধা, শ্রবনা, শতভিষা, চিত্রা, উত্তর ফাল্গুনী।

• মস্তক মুণ্ডনের ক্ষেত্রে-পুনর্বসু, মৃগশিরা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, রেবতী, পুষ্যা, চিত্রা, হস্তা, অশ্বিনী শুভ।

• হাতেখড়িতে-অশ্বিনী, পুনর্বসু, আর্দ্রা, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, শ্রবনা, রেবতী শুভ।

• উপনয়নে-অনুরাধা, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, রেবতী, রোহিনী,মৃগশিরা, পুনর্বসু, পুষ্যাভ শুভ।

• বিবাহের ক্ষেত্রে-রোহিনী, মৃগশিরা, মঘা, হস্তা, স্বাতী, অনুরাধা, মূলা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী শুভ।

• নতুন বস্ত্র পরিধানে-অশ্বিনী, রোহিনী, পুনর্বসু, পুষ্যাত, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, ধনিষ্ঠা, রেবতী শুভ।

• দাড়ি কাটায়-পুষ্যা, পুনর্বসু, রেবতী, হস্তা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, অশ্বিনী, চিত্রা, জ্যে ষ্ঠা, স্বাতী, শতভিষা শুভ।
• ব্যিবসার জন্য কেনাকাটা-পুষ্যার নক্ষত্র সবচেয়ে ভাল।

• বাসস্থান পরিবর্তনে-হস্তা, মৃগশিরা, অনুরাধা খুব ভাল। নিজের জন্ম নক্ষত্র অশুভ।

• উইল বানাতে-পুষ্যা নক্ষত্র শুভ।

• বাড়ি তৈরি, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য রোহিনী, মৃগশিরা, চিত্রা, হস্তা, জ্যে ষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা শুভ।

• দরজার ফ্রেম বসানোর জন্য শুভ হচ্ছে রোহিনী, মৃগশিরা, চিত্রা, অনুরাধা, উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ,রেবতী।

• কুয়ো খোঁড়ায়-রেবতী, উত্তর ভাদ্রপদ, হস্তা, অনুরাধা, মঘা, শ্রবণা, রোহিনী, পুষ্যা শুভ।

• গৃহপ্রবেশে-রোহিনী, মৃগশিরা, উত্তরাষাঢ়া, চিত্রা, উত্তর ভাদ্রপদ শুভ।

• জমি কেনায়-অশ্বিনী, রোহিনী, মৃগশিরা, পুনর্বসু, পুষ্যা, হস্তা, স্বাতী, অনুরাধা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তর ফাল্গুনী,উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ শুভ।

• বাড়ি কেনার জন্য-মৃগশিরা, অশ্লেষা, মঘা, বিশাখা, মূলা, পুনর্বসু, রেবতী শুভ।

• গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে-বীজ পুঁততে হবে হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, মঘা, পুষ্যাস, উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, রোহিনী,রেবতী, মূলা ও অনুরাধা নক্ষত্রে। ফুল গাছের বীজ পুঁততে মৃগশিরা, পুনর্বসু, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, অনুরাধা, রেবতী শুভ। এ ছাড়া অশ্বিনী সুপারীর শুভ, পুনর্বসু আখের ক্ষেত্রে শুভ, পুষ্যাষ শষ্যের ক্ষেত্রে শুভ, স্বাতী, শ্রবণা ধানের ক্ষেত্রে শুভ, অনুরাধা তিলের ক্ষেত্রে শুভ, মূলা লতানো গাছের ক্ষেত্রে শুভ, শতভিষা কালো দানার জন্য ভাল।

• ভ্রমণে শুভ নক্ষত্র-অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুষ্যা◌ী, পুনর্বসু, হস্তা, অনুরাধা, শ্রবণা, মূলা, ধনিষ্ঠা, রেবতী। ভরণী ও কৃত্তিকা চরম অশুভ।

• মামলা করার জন্য-অশ্বিনী, রোহিনী, মৃগশিরা, পুষ্যা◌া, হস্তা, চিত্রা, অনুরাধা, ধনিষ্ঠা, রেবতী শুভ।

জন্ম নক্ষত্র ফল

==========

১। অশ্বিনী- অশ্বিনী নক্ষত্রের অধিকর্তা কেতু। এই নক্ষত্রে জন্ম হলে জাতক হয় বুদ্ধিমান, মেধাবী, তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং নিজের চেষ্টায় জীবনে উন্নতি করে। প্রথম জীবনে বিদ্যা লাভ হয়। মধ্যবর্তী জীবনে কিছু কষ্টে ও ব্যয়ের মধ্যে দিয়ে কাটে। কর্ম ক্ষেত্র শুভ হয়। অনেকে তাকে মান্য করে নেতৃত্ব করতে পারে। আত্মীয় স্বজনদের জন্য চিন্তা থাকে। সন্তান প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। দাম্পত্যক্ষেত্র মধ্যম। জীবনে মাঝে মাঝে হঠাৎ উন্নতি আসে। শেষ বয়েসে কয়েক বছর কিছুটা কষ্ট পেতেও পারে। শুভবর্ষ - ৭, ১৬, ২৫, ৩৪, ৪৩, ৫২, ৬১, ৭০

২। ভরণী- ভরনী নক্ষত্রের অধিকর্তা শুক্র। এদের জীবনে শুভাশুভ মিশ্র ভাবে কাটে। এরা পরিশ্রমী কম হয়, তবে মেধা খাটিয়ে কর্ম পরিচালনা দ্বারা জীবনে উন্নতি করতে পারে। জীবনে সুযোগ মন্দ পায়না। জীবনের প্রথম দিকে অশুভভাবে কাটে। মধ্য বয়েস থেকে শুভ ভাব চলে। তখন অর্থ সঞ্চয় করলে শেষ জীবন সুখে কাটে। অর্থ বেশী অপচয় করলে বেশী বয়েসে আর্থিক দূশ্চিন্তায় ভোগে। দাম্পত্য জীবন বেশী সুখের নয়। শুভবর্ষ- ৬, ১৫, ২৪, ৩৩, ৪২, ৫১, ৬০, ৬৯,

৩। কৃত্তিকা- কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধিকর্তা রবি। এরা যথেষ্ট পরিশ্রমী হয়। স্পষ্ট সত্যকথা বলতে ভালো বাসে। এদের জীবনে মাঝে মাঝেই বাধাবিঘ্ন আসে। অনেকেই এদের ভুল বোঝে। জীবনে অনেক বাধা বিঘ্ন আসলেও শ্রম দ্বারা এরা উন্নতি করতে সফল হয়। মাঝে মাঝে পাড়া প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে অন্যের প্রতি ভাল কাজ করলেও যশ বা প্রতিদান কম পায়। দাম্পত্যক্ষেত্র মোটামুটি শুভ। শুভবর্ষ- ১৯, ২৮, ৩৭, ৪৬, ৫৫, ৬৪, ৭৩,

৪। রোহিনী- রোহিনী নক্ষত্রের অধিকর্তা চন্দ্র। চন্দ্রের প্রকৃতি কিছুটা এদের মধ্যে থাকে। এরা শান্তিপ্রিয় এবং সবকিছু সমস্যার সমাধান ধীরে ধীরে করতে চায়। লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়। অনেক সময় এরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রিয় হয়। এরা সরল লোক ভালবাসে। নানা কাজে পার্গত হয়। শুভবর্ষ- ১৩, ১৬, ২২, ২৫, ৩১, ৪০, ৪৯, ৫২, ৫৮, ৬১, ৬৭, ৭০,

৫। মৃগশিরা-মৃগশিরা নক্ষত্রর অধিকর্তা মঙ্গল। এরা ধীর স্থির কিন্তু কোন অন্যায় দেখলে এদের মাথা গরম হতে পারে। এদের মধ্যে মাঝে মাজে একটু দ্বিমনা ভাব দেখা যায়। অনেকে এদের শ্রদ্ধা করে। এবং এরা মিশুকে হয়।

এদের জীবনে মাঝে মাঝে কর্মোন্নতির শুভ যোগ আসে। কিন্তু আত্মীয় ও পরিবেশ থেকে মনে আঘাত পায়। শুভবর্ষ - ৩, ৫, ১২, ১৪, ২১, ২৩, ৩০, ৩২, ৩৯, ৪১, ৪৮, ৫০, ৫৭, ৫৯, ৬৬, ৬৮,

৬। আদ্রা- আদ্রা নক্ষত্রের অধিকর্তা রাহু। এদের নিজ শ্রমদ্বারা উন্নতি করার চেষ্টা থাকে। তবে কাজে সফল হয়না। আকস্মিক প্রাপ্তি যোগ থাকে। মানসিক চাঞ্চল্য ও দূশ্চিন্তার ভাব থাকে। দাম্পত্যক্ষেত্র শুভ নয়। মাঝে মাঝে নানা রোগ ভয়। শুভবর্ষ- ৪, ৬, ১৩, ১৫, ২২, ২৪, ৩১, ৩৩, ৪০, ৪২, ৪৯, ৫১ ,৫৮, ৬০, ৬৭, ৬৯,

৭। পুনর্বসু- পুনর্নবসু নক্ষত্রর অধিকর্তা বৃহস্পতি। এরা মেধাবী হয় ও জীবনে উন্নতি করতে পারে। প্রচুর সন্মান ও অর্থ লাভ করে থাকে। প্রায়ই মানসিক শান্তি ও আনন্দে থাকে। ভাই বোনদের জন্য কিছু চিন্তা হতে পারে। অনেকের বন্ধুত্ব ও সাহায্য লাভ করে। ব্যবসা ও চাকরি দুটোই শুভ। শুভবর্ষ ৭, ৯, ১৬, ১৮, ২৫, ২৭, ৩৪, ৩৬, ৪৩, ৪৫, ৫২, ৫৪, ৬১, ৬৩, ৭০, ৭২,

৮। পুষ্যা- পুষ্যা নক্ষত্রর অধিকর্তা শনি। এরা খুব ধার্মিক হয়। সংসারে আসক্তি কম থাকে। আধ্যাত্মিকভাব প্রবল হয়। মনুষ্যের মঙ্গল করতে ভালো বাসে। এদের মধ্যে যোগ জ্যোতিষ আধিভৌতিক প্রভৃতির দিকে আকর্ষণ থাকে। ভাগ্য শুভ, কর্মলাভ অর্থলাভ ও নানা দিকে উন্নতি হয়। গুরুজন ব্যাক্তিদের জন্যে চিন্তা থাকে। শুভবর্ষ ৬, ৮, ১৫, ১৭, ২৪, ২৬, ৩৩, ৩৫, ৪২, ৪৪, ৫১, ৫৩, ৬০, ৬২, ৬৯, ৭১,

৯। অশ্লেষা- অশ্লেষা নক্ষত্রর অধিপতি বুধ। এদের জীবনে সব সময় দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ভাব থাকে দ্বিমনা ভাবের থাকে। অনেক কাজ শুরু করে শেষ করতে পারেনা। তাই জীবনে অতৃপ্তি আসে। তবে শ্রম করলে উন্নতি হবেই। দাম্পত্য শুভ হয়। মাঝে মাঝে বাধা বিপত্তি ও চিন্তা হতাশায় জীবন উত্থান, পতন, হতেই থাকবে। শুভবর্ষ- ৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬৩, ৬৯, ৭২,

১০। মঘা- মঘা নক্ষত্রর অধিকর্তা কেতু। এরা খুব তেজী হয় এবং আত্ম অভিমান প্রবল হয়। এরা স্পষ্ট কথা বলতে ভাল বাসে। তাই অনেকের অপ্রিয় হয়। এদের মেধাশক্তি খুব উচ্চ নাও হতে পারে। মধ্যম ভাবে জীবন কাটে। নানা বাধার মধ্যে দিয়ে উন্নতি হয়। কিন্তু সময়ে হতাশা দেখা দেবে। মনে আবেগ প্রবনতা থাকে। শুভবর্ষ- ১০, ১২, ১৯, ২১, ২৮, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৪৮, ৫৫, ৫৭, ৬৪, ৬৭,

১১। পুর্বফল্গুনী- পুর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রর অধিকর্তা শুক্র এরা মিষ্টিভাষী ও ধীর স্থির এবং একটুগম্ভীর প্রকৃতির হয়। যা করবে মন স্থির করে নেয় সময় বিশেষ কখন প্রকাশ করেনা। অন্যের সমালোচনা করে নির্ভীক ভাবে। ভয় কম থাকে। সময়ে কিছু স্বার্থ ভাব দেখা যায়। নারীর প্রতি আকর্ষণ থাকে। এদের জীবনে শুভযোগ অর্থ, আনন্দলাভ,ও সাংসারিক দিকে উন্নতি হয়। শুভবর্ষ- ১১, ১৫, ২০, ২৪, ২৯, ৩৩, ৩৮, ৪২, ৪৭, ৫১, ৫৬, ৬০, ৬৫, ৬৯,

১২। উত্তরফাল্গুনী- উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রর অধিকর্তা রবি। এরা খুব ভক্তিমান হয়। এবং ঈশ্বরের কৃপালাভ করে। এরা স্ত্রীর বশীভূত হতে পারে। সত্য ও সৎ পথে থেকেই এরা উন্নতিসাধন করে। জাতক সুহৃদয়শীল হয় অনেককে

সাহায্য করতে ভাল বাসে। এরা সৎবুদ্ধিযুক্ত এবং সদ্ভাবনার হয়। শুভবর্ষ- ৩, ৭, ১২, ১৬, ২১, ২৫, ৩০, ৩৪, ৩৯, ৪৩, ৪৮, ৫২, ৫৭, ৬১, ৬৬, ৭০,

১৩। হস্তা- হস্তা নক্ষত্রর অধিকর্তা চন্দ্র, এরা চোখের রোগ,বাত, পিত্তরোগ, সর্দিকাশি, প্রভৃতিতে কষ্ট পেতে পারে। এরা জ্ঞানী, বিচক্ষণ, বুদ্ধীমান, চতুর ও মেধাবী হয়। জাতক দীর্ঘায়ূ হয়। পারিপার্শিক বাধা না এলে এরা বিরাট শিক্ষিত হয়। নিজ বুদ্ধির দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। শুভবর্ষ- ৪, ১২, ১৩, ২১, ২২, ৩০, ৩১, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৯,. ৫৭, ৫৮, ৬৬, ৬৭,

১৪। চিত্রা- চিত্রা নক্ষত্রর অধিকর্তা মঙ্গল। এরা সত্যবাদী, বিচক্ষণ ও অল্পাহারী হয়। ছোটখাট রোগ ব্যাধি অনেক হয়। অর্থ উপার্জন করে মধ্যম। বহূ কুটুম্ব থাকে। ক্ষমতাশালী হলেও একটু অলস হয়। দাঁতের রোগের ভয়। এরা মাঝে মাঝে জনসাধারনের প্রিয় হয়। কখন আবার অপ্রিয় হয়। উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে জীবন। তবে এদের তেজ ও সাহস থাকে মনের জোর প্রচুর। শুভবর্ষ- ১৪, ২১, ৩২, ৩৯, ৪১, ৪৮, ৫৭, ৫৯, ৬৬, ৬৮, ৭৫,

১৫। স্বাতী- স্বাতী নক্ষত্রর অধিকর্তা রাহু। এদের মধ্যে শান্তভাব থাকবে। তবে কখন বা হঠাৎ করে রেগে ওঠে। এদের কপালস্থুল, দাতা, সুবুদ্ধিমান, সৎপরামর্শ দাতা, বিদ্বান হয়। এরা ধনবান হলেও মনে বৈরাগ্য ভাব থাকে। এরা হয় দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ। সন্তানদের জন্য বিশেষ চিন্তা থাকে। দাঁত ও পেটের রোগের ভয়। শুভবর্ষ-৪, ৬, ১৩, ১৫, ২২, ২৪, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৪০, ৪২, ৪৯, ৫১, ৫৮, ৬০, ৬৭, ৬৯,

১৬। বিশাখা- বিষাখা নক্ষত্রর অধিকর্তা বৃহস্পতি। এদের মাথাভার মাথাব্যাথা, পিত্তরোগ হতে পারে। এরা হয় দেবভক্ত, সত্যবাদী, এবং জিতেন্দ্রিয়। ধার্মিক ভাব থাকে প্রায়ই জ্ঞানী হয়। অজীর্ণরোগ হয়। মোটামুটি সন্দেহ যুক্ত ও কামী হয়। তবে এরা নিজ চেষ্টা দ্বারা ধনী হয়। এদের হৃদয়ে সদ্ভাবনা প্রচুর থাকে। কারো সঙ্গে ঝমেলা পছন্দ করে না। তবে রেগে গলে মাথা খুব গরম হয়। শুভবর্ষ- ৭, ৯, ১৬, ১৮, ২২, ২৫, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪৩, ৪৫, ৫২, ৫৪, ৬১, ৭০, ৭২,

১৭। অনুরাধা- অনুরাধা নক্ষত্রর অধিকর্তা শনিদেব। এদের দেহ শ্যামবর্ণ হয়, এরা খুব গভীর ও দয়ালু প্রকৃতির হয়। ধর্মে মতি থাকে। চেষ্টা করলে যথেষ্ট জ্ঞাণ লাভ করতে পারে। এদের পেটের বা লিভারের রোগ হয়। এরা সুদেহী, কামভাব বেশি। শ্রম দ্বারা ভাল অর্থ উপার্জন করতে পারে। মননশীলতা থাকে, তবে অতিব্যয় দেখলে মাথা গরম হয়। শুভবর্ষ-৬, ৮,১৫, ১৭, ২৪, ২৬, ৩৩, ৩৫, ৪২, ৪৪, ৫১, ৫৩, ৬০, ৬২, ৬৯, ৭১,

১৮। জেষ্ঠা- জেষ্ঠা নক্ষত্রর অধিকর্তা বুধ, এরা খুব দয়ালু হৃদয়বান থাকে। চেষ্টা করলে এরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারে। বাতরোগ পিত্তরোগ মাথার রোগ হতে পারে। এদের মধ্যে অল্প বয়েসে বেশী বুদ্ধির বিকাশ হয় এরা খুব বাস্তববাদী ও শ্রমশীল। তবে প্রচুর আয় করে গরীব দঃখীদের সাহার্য্য করে থাকে। শুভবর্ষ-৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬৩, ৬৯, ৭২,

১৯। মূলা- মূলা নক্ষত্রর অধিকর্তা কেতু। এদের কপাল হয় গজের মতো। শীতলদেহ বিপরীত লিঙ্গের বশীভূত হয়। এরা গান বাজনা ভাল শিখতে পারে, এরা খুব আড়াম্বর প্রিয় হয়। চোখ একটু রক্তাভ। এদের বহু আত্মীয় কুটুম্ব থাকে। এরা প্রায়ই একটু কৃপণ হয়। সন্তানের জন্য বিশেষ চিন্তা থাকে। দাম্পত্য মধ্যম, এরা নিজ মনের কথা প্রায় লুকিয়ে রাখে। শুভবর্ষ- ৭, ১০, ১৬, ১৯, ২৫, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪৩, ৪৬, ৫২, ৫৫, ৬১, ৬৪, ৭০, ৭৩,

২০। পূর্বাষাঢ়া-পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রর অধিকর্তা শুক্র, এদের কপাল স্থূল।এরা লেখাপড়া ভাল শিখতে পারে। একটু আড়ম্বরপ্রিয় চোখ একটু রক্তাভ।এদের অেক আত্মীয় কুটুম্ব থাকেএকটু খরচী হয়।এরা গৌরবর্ণর শুচি বদন জাতক দীর্ঘায়ূ এবং বাবা মার প্রিয় হয়।বহু লোকের ও আপন আত্মীয়র আশ্রয়দাতা হয়। তবে প্রশংসা কম পায়। শুভবর্ষ- ৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪, ৩০, ৩৩, ৩৯, ৪২, ৪৮, ৫১, ৫৭, ৬০, ৬৬, ৬৯,

২১। উত্তরষাঢ়া- উত্তরষাঢ়া নক্ষত্রর অধিকর্তা রবি। এদের দেহ একটু স্থূল মতো মনে গর্বিত ভাব থাকে। জাতকের যশ লাভহয়। গান বাজনা ও শিল্পে পার্গত হয়। এদের অজীর্ণ উদারময় বাতরোগ লিভার রোগ, অম্লরোগ দেখা দেয়। পিঠ একটু কুঁজো ভাব, এরা অনেকের শ্রদ্ধালাভ করে এবং সন্মানিত হয়। এদের কাছে থেকে সবাই সমান সাহায্য পায়না। শুভবর্ষ- ৩, ১০, ১২, ১৯, ২১, ২৮, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৪৮, ৫৫, ৫৭, ৬৪, ৬৬, ৭৩,

২২। শ্রবনা- শ্রবনা নক্ষত্রের অধিকর্তা চন্দ্র। এদের দেহ একটু কঠিন হয়। চাপা গজ কপাল, শ্যামবর্ণ হয়। এদের বাতরোগ, লিভাররোগ, অম্ল, অজীর্ণ, রোগ হয়। চোখ একটু রক্তাভ হয়। এরা বেশ সু-রসিকহয়। পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান শ্রম দ্বারা জীবনে উন্নতি করে। খরচা বেশী করতে চায় না। শুভবর্ষ- ১৩, ১৬, ২২, ২৫, ৩১, ৩৪, ৪০, ৪৩, ৪৯, ৫২, ৫৮, ৬১, ৬৭, ৭০,

২৩। ধনিষ্ঠা- ধনিষ্ঠা নক্ষত্রর অধিকর্তা মঙ্গল।এরা গৌরবর্ণ ধার্মিক ও দেবভক্ত হয়।পেটের রোগ ও অজীর্ণ রোগ হয়।উপার্জন মধ্যম হয়।মন খুব চঞ্চল, খেতে ভাল বাসে।মাঝে সময়ে ভ্রমনে খুশী হয়।অনেক সময় ধনী ও দাতাহয়।মাঝ বয়েস থেকে সুখী হয় প্রথম জীবনে সংগ্রাম। শুভবর্ষ- ১৪, ২১, ২৩, ৩০, ৩২, ৩৯, ৪১, ৪৮, ৫০, ৫৭, ৫৯, ৬৬, ৬৮, ৭৫,

২৪। শতভিষা- শতভিষা নক্ষত্রর অধিকর্তা রাহু। এদের মন বেশ পবিত্র এবং সত্যনিষ্ঠ হয়। জীবনে অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারে। শ্যামবর্ণ হয়। এদের আমবাত এলার্জি স্নায়বিক ও চোখের রোগ হয়। এরা বিবেকি এবং বৈরাগ্য ভাবের হয়। শেষ জীবনে সন্ন্যাস ধর্ম লাভ করতে পারে। ব্যাবহার মধুর তবে স্বভাব চাপা। শুভবর্ষ-৪, ৬, ১৩, ১৫, ২২, ২৪, ৩১, ৩৩, ৪০, ৪২, ৪৯, ৫১, ৫৮, ৬০, ৬৭, ৬৯,

২৫।- পূর্বভাদ্রপদ- নক্ষত্র অধিকর্তা বৃহস্পতি।এদের কপাল প্রশস্ত নাসা উন্নত হয়।দেহ তাম্রবর্ণ।বিপরীত লিঙ্গের বশীভূত হয়।এরা পরোপকারী এবং দয়ালু প্রকৃতির হয়।রূপ সুন্দর হয়, রাজভক্ত রাজসেবক হতে পারে।জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন যেমন করে তেমন খরচও অত্যাধিক করে।গৃহ নির্মাণ যোগ আছে। জাতক বিদ্বানও হয়। শুভবর্ষ-৭, ৯, ১৬, ১৮, ২৫, ২৭, ৩৪, ৩৬, ৪৩, ৪৫, ৫২, ৫৪, ৬১, ৬৩, ৭০, ৭২,

২৬। উত্তরভাদ্রপদ- উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র অধিকর্তা শনিদেব। এরা গৌরবর্ণ ও রূপবান হয়। গম্ভীর ভাব থাকে, সরকারী কাজ করলে প্রচুর উন্নতি করে।এরা নির্জনতা পছন্দ করে যাদুবিদ্যা, জ্যোতিষ, গভীর জ্ঞানের পুস্তক পাঠ প্রভৃতি ভাল বাসে। হালকা ভাব সদাই পছন্দ করে। এদের মন বাইরে বোঝা কঠিন। শুভবর্ষ- ৬, ৮, ১৫, ১৭, ২৪, ২৬, ৩৩, ৩৫, ৪২, ৪৪, ৫১, ৫৩, ৬০, ৬২, ৬৯, ৭১,

২৭। রেবতী নক্ষত্র অধিকর্তা বুধ। এরা সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, গৌর বর্ণ জ্ঞাণী মানী এবং বিরাট যশস্বী হতে পারেন। এদের কেশ দীর্ঘ ও কাম ভাব বেশী থাকে এবং একাধিক পুরুষ/নারীতে আকৃষ্ট হতে পারেন। এরা বাইরে হালকা স্বভাব কিন্তু ভিতরে ভীষণ চতুর। মাঝে মাঝে দ্বিমনা ভাব দেখা যায়। অনেক সময় খেয়ালের বশে অনেক কাজ করেন। বৃদ্ধি ও শিল্পী কাজে এরা প্রচুর উপার্জন করে। শুভবর্ষ-৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬৩, ৬৯, ৭২

তথ্য সূত্র: ফলিত জ্যোতিষ- শ্রী রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়
দ্য অস্ট্রোলোজিকাল ম্যাগাজিন

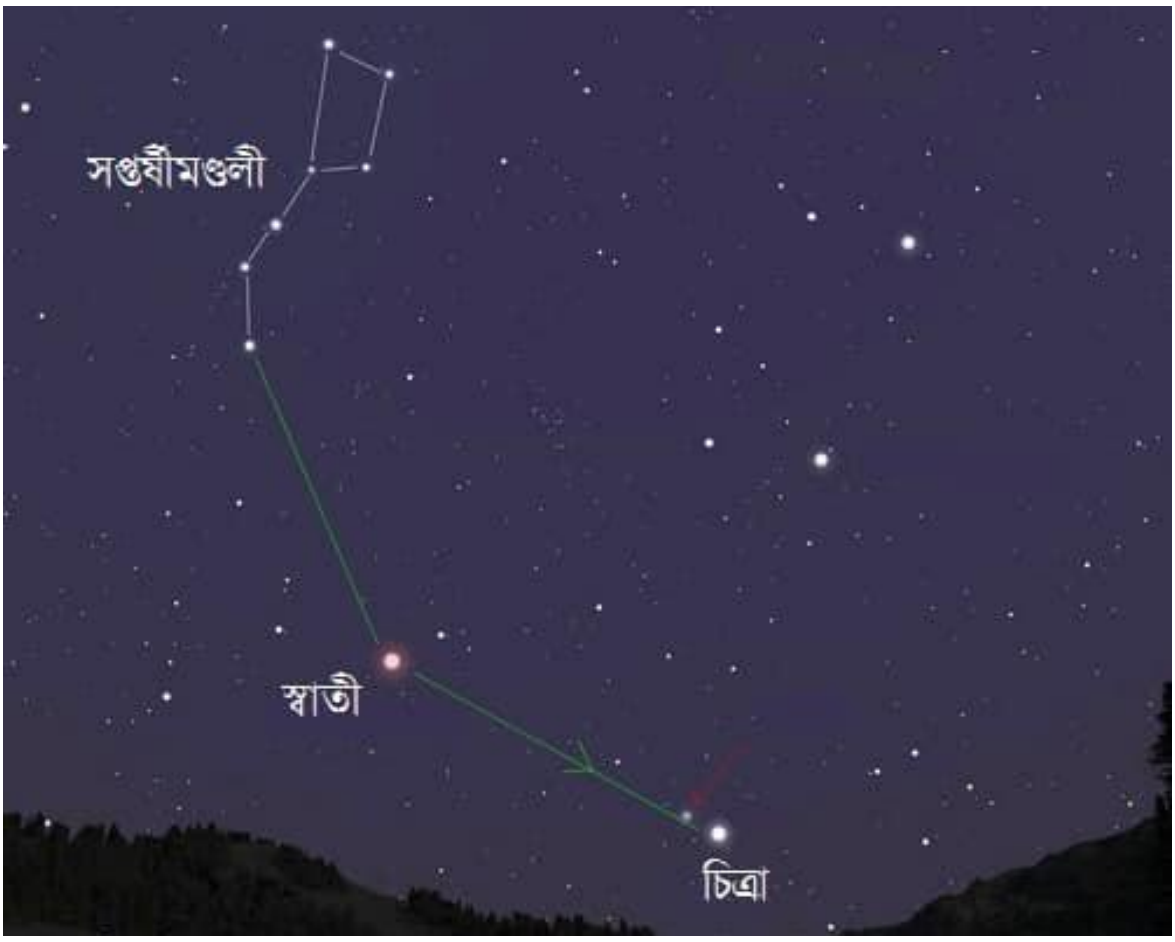

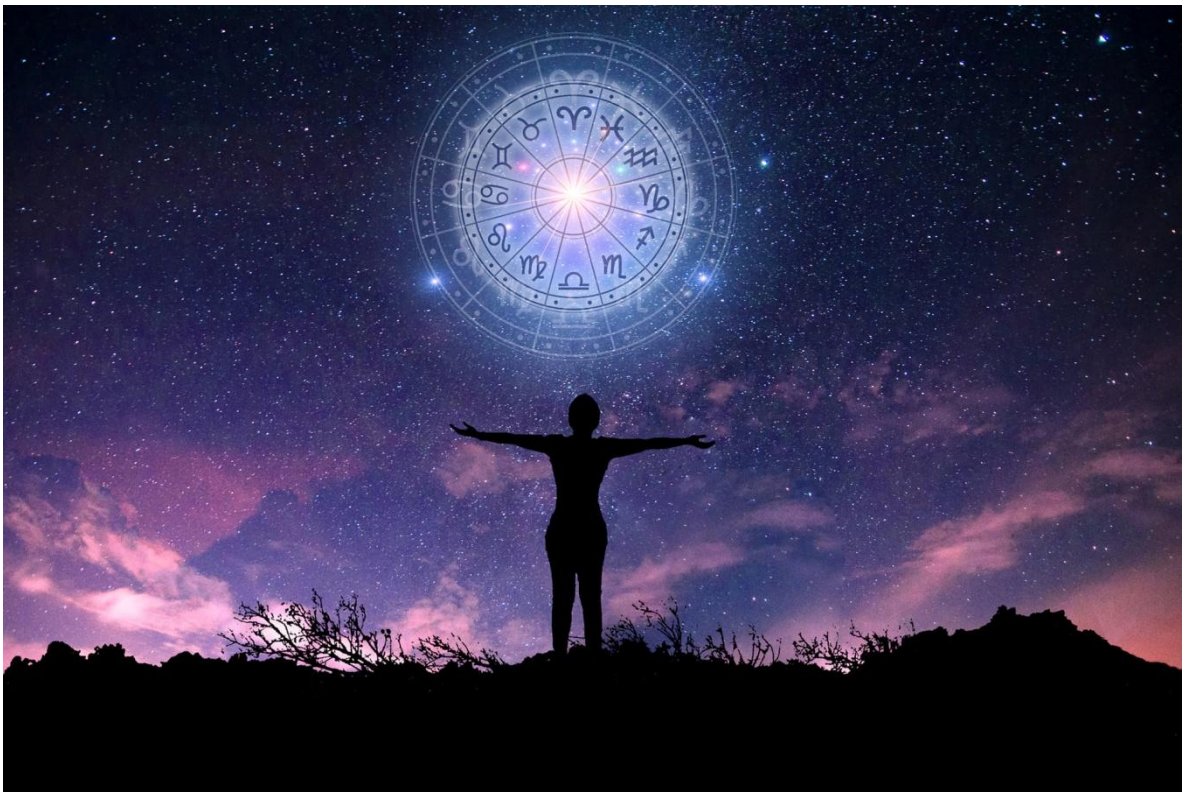

॥পঞ্চম পর্ব॥

নক্ষত্র নির্দিষ্ট রোগ

****

গ্রহগন এবং রাশিগনের কাতরতায় মানবদেহে যেমন কিছু কিছু রোগের প্রভাব রয়েছে তেমনি নক্ষত্র কাতরতায় কিছু কিছু রোগের প্রভাব বর্তমান। এখানে নক্ষত্র প্রভাবিত সম্ভাব্য রোগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হলো:

অশ্বিনী নক্ষত্রবাতবেদনা : অনিদ্রা, মতিভ্রম, শিরঃপীড়া।

ভরণী নক্ষত্রস্নায়ুবিক দুর্বলতা : অলসতা এবং প্রবল জ্বর।

কৃত্তিকা নক্ষত্রকলিক ব্যথা : প্রদাহ, অনিদ্রা।

রোহিণী নক্ষত্রজ্বর : মাথারযন্ত্রণা, মাথাধরা, প্রলাপ এবং কুক্ষিগতউদর বেদনা।

মৃগশিরা নক্ষত্রবাতব্যাধি : চর্মরোগ।

আদ্রা নক্ষত্রবাতবেদনা : জ্বর, অনিদ্রা এবং শ্লেষ্মাঘটিত পীড়া।

পুনর্বসু নক্ষত্রজ্বর : শিরোরোগ, কোমরের ব্যথা।

পুষ্যা নক্ষত্রজ্বর : শরীর বেদনা এবং পিত্ত প্রদাহ।

অশ্লেষা নক্ষত্রপায়ের ব্যথা : সর্বাঙ্গে কষ্টদায়ক অস্থিরতা।

মঘা নক্ষত্রবাত বেদনা : শিরোরোগ।

পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রজ্বর : শিরোপীড়া, সর্বাঙ্গে কষ্টদায়ক অস্থিরতা।

উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রজ্বর : বাত বেদনা।

হস্তা নক্ষত্রউদর বেদনা : কোষ্ঠবদ্ধতা।

চিত্রা নক্ষত্ররতা। কষ্টদায়ক অস্থি :

স্বাতী নক্ষত্রকষ্টদায়ক জ্বর : অস্থিরতা।

বিশাখা নক্ষত্রউদরবেদনা : সর্বাঙ্গে তাপ বৃদ্ধি।

অনুরাধা নক্ষত্রতীব্র জ্বর : শিরোরোগ, সর্বাঙ্গে অস্থিরতা।

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রশরীর কম্পন : পিত্তরোগ।

মূলা নক্ষত্রউদররোগ : মুখের রোগ।

পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রকম্পোজ্বর : সর্বাঙ্গে প্রদাহ,শিরোরোগ।

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রকোমরে বাত : শূলবেদনা, বিকার জ্বর।

শ্রবণা নক্ষত্রমুত্রকৃচ্ছ : জ্বর, অতিসার।

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রআমাশয় : কম্পন, জ্বর।

শতভিষা নক্ষত্রজ্বর : বাত, সন্নিপাত।

পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রবমন : শিরোপীড়া, অস্থিরতা।

উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রবাতবেদনা : দন্তশূল।

রেবতী নক্ষত্রপিত্তঘটিত রোগ : জ্বর, বাত।

নক্ষত্র প্রভাবিত রোগ সকল অধিকাংশই অল্পস্থায়ী রোগ। মানব শরীরে দ্বাদশ রাশি ও গ্রহ সকল প্রভাবিত যে সকল বিশেষ কষ্টদায়ক ও মারাত্মক রোগ রোগ হয়, এগুলো তার ‘সহকারি রোগ মাত্র।’ যেমন জ্বর, শিরোরোগ, ব্যথা বেদনা, সর্বাঙ্গে কষ্ট ও অস্থিরতা প্রায় সকল বড় রকমের রোগের উপসর্গগ মাত্র। সুতরাং এগুলো রাশি ও গ্রহ নির্দিষ্ট রোগকেই প্রভাবিত করে।

[এটা গড় বিচার, এর সাথে জাতকেরজাতিকার জন্মছক/, গোচর, দশা বিচার জরুরী]

পুরাণ মতে

****

হিন্দু পুরাণে ২৮ টি নক্ষত্র নিয়ে গল্প আছে।

‘পুরাণ’ মানে চিরন্তন, আদিম, অনাদিসিদ্ধ। ‘প্রেম’ হল প্রিয়ভাব, ভালবাসা, অনুরাগ, যুবক যুবতীর-ধ্বংসরহিতভাববন্ধন।

ভারতীয় পুরাণ হল বিশাল এক সমুদ্র। সাধারণত তার দু'টি ধারার কথা জানা যায়। একটি সূর্যবংশ এবং অন্যটি চন্দ্রবংশ। সূর্যের প্রেম দিয়ে শুরু করা যাক।

এই সূর্য কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নন, তিনি সৌরমণ্ডলের প্রধান দেবতা। পুরাণ বলে, ঊষা সূর্যের জনয়িত্রী, সূর্য প্রণয়ীর মতো এই সুন্দরীকে অনুগমন করেন। তিনি ঊষার কোলে দীপ্তি পান আবার ঊষা তাঁর স্ত্রী। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিবাহ হয়, কিন্তু সংজ্ঞা সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে তাঁর অনুরূপ একজনকে সৃষ্টি করে সূর্যের কাছে রেখে উত্তরকুরুবর্ষে পালিয়ে যান। অনুরূপার নাম ছায়া, তাঁরই সঙ্গে প্রেম প্রণয় চলতে থাকে- সূর্যের। ছায়ার গর্ভে সূর্যের দু'টি সন্তান হয়। কিছুদিন পর সূর্য বোঝেন, ছায়া সংজ্ঞা নন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি প্রণয়িনী সংজ্ঞাকে খুঁজতে বের হন।

ওদিকে উত্তরকুরুবর্ষে সংজ্ঞা অশ্বিনীর রূপ ধরে আত্মগোপন করে রয়েছেন। সূর্য অশ্বের বেশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে রমণ করেন ও যমজ পুত্রের জন্ম দেন। তারপর শ্বশুর বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ অনেকখানি কমিয়ে দিলে সংজ্ঞা তাঁর সঙ্গে পুনরায় ঘর করতে থাকেন। ছায়া ও সংজ্ঞা দুই সপত্নী সূর্যের প্রেমে মগ্ন ছিলেন। সূর্যের প্রেমিকার সংখ্যা অনেক। কুন্তী তাঁর ঔরসে পুত্র উৎপাদন করেছেন। ঋক্ষরজা সূর্যের বীর্য ধারণ করে সুগ্রীবের জন্ম দেন। সূর্যবংশের রাজা দিলীপ মারা গেলে তাঁর দুই সপত্নী মিলে ভগীরথের জন্ম দেন। ভগীরথ রামের পূর্বপুরুষ। সূর্য-ছায়ার কন্যা তপতী প্রেম ও বিবাহ করেন চন্দ্রবংশীয় রাজা সংবরণকে।

পুরাণে সবচেয়ে বড় প্রেমিকপুরুষ হলেন চন্দ্র। রাজা দক্ষের সাতাশটি কন্যা ছিল তাঁর সঙ্গিনী। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন রোহিণীকে। তাই বাকি ছাব্বিশ কন্যা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যান। দক্ষরাজ চন্দ্রকে তিরস্কার করে ছাব্বিশ কন্যাকে পুনরায় চন্দ্র ভবনে পাঠালেন। কিন্তু চন্দ্রের রোহিণীপ্রেম এত প্রবল-, যে আবার বাকি কন্যারা বাপের বাড়ি চলে গেল। এইভাবে বারবার দক্ষ কন্যাদের পাঠানো সত্ত্বেও যখন চন্দ্র মুখ তুলে অন্যদের দিকে তাকালেন না, তখন দক্ষ চন্দ্রকে যক্ষ্মারোগগ্রস্থ হওয়ার অভিশাপ দিলেন। পরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর চেষ্টায় তাঁর শাপমুক্তি ঘটে।

শুধু কমনীয়তা নয়, শৌর্যবীর্যেও চন্দ্র হয়ে উঠলেন অপরাজেয়। দেবতাদের স্ত্রীরা চন্দ্রের প্রেমে পড়তে- লাগলেন। প্রজাপতি কর্দমের স্ত্রী সিনীবালী, বিভাবসুর স্ত্রী দ্যুতি প্রভৃতি বহু দেবতাপত্নী চন্দ্রভবনে এসে চন্দ্রপ্রেমে মাতোয়ারা হলেন। এমনকি নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মীও চন্দ্রঅনুরাগে ভেসে গেলেন।-

মদমত্ত রোম্যান্টিক চন্দ্র একদিন বাগানে এক অসামান্য শারীরিক গঠনসম্পন্ন, আকর্ষণীয়া এক নারীকে দেখে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সেই রমণীও চন্দ্রের বাহুডোরে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। চন্দ্র তাঁকে চিনতে পারলেন, তিনি আর কেউ নন; গুরুপত্নী– দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারা। তারা ও চন্দ্র প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেলেন। শুধু তাই নয়, তারাদেবী পতিগৃহে ফিরলেন না, থেকে গেলেন চন্দ্রভবনে। বৃহস্পতি তাঁর এক শিষ্যকে পাঠালেন, কিন্তু চন্দ্র তারাকে ফিরিয়ে দিলেন না। বারবার দূত পাঠানো হল। লাভ হল না।

শেষমেশ ক্রুদ্ধ বৃহস্পতি নিজেই গেলেন চন্দ্রভবনে। তিনি চন্দ্রকে জানালেন, গুরুপত্নী মাতৃস্থানীয়া। চন্দ্র বললেন, তারা আমার কাছে সুখেই আছেন, পালিয়ে যাওয়া একজন স্ত্রীলোকের প্রতি এত ভালবাসা দেখে আপনার উপর আমার মায়া হচ্ছে গুরুদেব। নীতিশাস্ত্রে আছে, কোনও মহিলা যদি স্বেচ্ছায় কোনও পুরুষের সঙ্গে রমণ করেন তবে সেই পুরুষের কোনও পাপ হয় না। বৃহস্পতি তারার স্বামী হলেও চন্দ্র তাঁর প্রেমিক, অতএব তারাকে ত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং তারার কথা ভুলে যান।

ব্যাস। চন্দ্রমহাদেব রয়েছেন বৃহস্পতির পক্ষে-তারার প্রেম নিয়ে যুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। ইন্দ্র-, অসুরগণ ও শুক্রাচার্য রয়েছেন চন্দ্রের দিকে। যুদ্ধ হল। এরই মধ্যে চন্দ্রপিতা অত্রি এসে তারাকে মুক্তি দিতে বললেন। চন্দ্র তারাকে ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু তত দিনে তারা গর্ভবতী। বৃহস্পতির গৃহে তিনি সযত্নে গর্ভরক্ষা করলেন। যথাকালে একটি পুত্র প্রসব করলেন তারা। লোকজন বলল, এই পুত্র বৃহস্পতির নয়, সে চন্দ্রের ঔরসজাত। বৃহস্পতি সে কথা মানলেন না। তারা ব্রহ্মাকে জবাব দিলেন, এই পুত্র চন্দ্রের। সেই নবজাতকের নাম রাখা হল ‘বুধ’। চন্দ্র পুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন। বুধ এবং কিম্পুরুষ ইলা র-(যিনি আদতে ছিলেন সূর্যবংশীয় রাজা) সুদ্যুম্ন-পুত্রের নাম হল পুরূরবা। বুধ এবং ইলার প্রেমও সুবিদিত।

পুরূরবাবিখ্যাত। মিত্র ও বর-ঊর্বশীর প্রেমও পুরাণ-এর শাপে ঊর্বশী মর্ত্যে এলে পুরূরবা তাঁর প্রেমে পড়েন। ঊর্বশী কোনওভাবেই ধরা দিতে চান না। শেষমেশ কয়েকটি শর্তে ঊর্বশী তাঁর সঙ্গে সহবাস করতে সম্মত হন। ১ ((২ ঊর্বশী যেন কোনও দিন পুরূরবাকে নগ্ন না দেখেন।ঊর্বশী কামাতুরা হলে তবেই মৈথুনক্রিয়া হবে। ৩ (ঊর্বশীর বিছানার পাশে দু’টি ভেড়ার বাচ্চা থাকবে যারা কখনও অপহৃত হবে না এবং ৪তাঁরা দু (’জনে এক সন্ধ্যা শুধু ঘি খেয়ে থাকবেন। পুরূরবা প্রেম ও বিবাহের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে দীর্ঘদিন এক সঙ্গে প্রেম, প্রণয়, সঙ্গম ইত্যাদিতে মত্ত রইলেন। ওদিকে স্বর্গে ঊর্বশীকে পাওয়ার জন্য দেবতারা ছটফট করছেন।

একদিন বিশ্বাবসু নামক এক গন্ধর্ব ভেড়া দু’টিকে চুরি করেন, ঊর্বশী তাদের উদ্ধার করার জন্য কাঁদতে লাগলে, পুরূরবা নগ্ন অবস্থায় উঠে বিশ্বাবসুকে ধাওয়া করেন। সেই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকায় এবং ঊর্বশী পুরূরবাকে নগ্ন দেখতে পান। শর্ত অনুযায়ী ঊর্বশী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বিরহকাতর পুরূরবা ঊর্বশীকে খুঁজতে লাগলেন দেশেবিদেশে। একদিন ঊর্বশীকে স্নানরত অবস্থায় কুরুক্ষেত্রে দেখতে পেলে পুরূরবা তাঁকে প্রত্যাবর্তনের কাতর অনুরোধ জানান। ঊর্বশী জানান, না; তবে তোমার ঔরসে আমি গর্ভবতী, এক বছর পর এস, তোমাকে সন্তান উপহার দেব আর বছর শেষে এক রাত্রি তোমার সঙ্গে যাপন করব।

এইভাবে সাত বছর তাঁদের রাত্রিযাপন চলতে থাকে। তাঁদের যাপনের সন্তানরা আসতে থাকেন পৃথিবীতে–আয়ু, বিশ্বায়ু, শতায়ু, অমাবসু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু প্রভৃতি। পুরূরবার এহেন প্রেম দেখে গন্ধর্বরা তাঁকে বর দিতে চাইলেন। তিনি জানালেন, ঊর্বশীর সঙ্গে চিরজীবন যাপন করতে চান। পুরূরবা গন্ধর্বলোকে জায়গা পেয়ে ঊর্বশীর চিরসঙ্গী ও চিরপ্রেমিক হয়ে বাস করতে লাগলেন।

পুরূরবার এক বংশধর হলেন যযাতি। যযাতি যাঁকে বিবাহ করেছিলেন সেই শুক্রকন্যা দেবযানী আসলে ছিলেন কচের প্রেমিকা। বৃহস্পতিপুত্র কচ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। তার পর ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর সঙ্গে বিবাহ হয় যযাতির। যযাতি ছিলেন অসুরগুরু বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাতে আসক্ত। সেই নিয়ে যযাতির সঙ্গে দেবযানীর তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়।

যযাতির পুত্রদের থেকে যদুবংশ ও পুরুবংশের সূচনা হয়। পুরুবংশের এক পরাক্রমশালী রাজা হলেন দুষ্মন্ত। তাঁর সঙ্গে শকুন্তলার প্রেম ও গান্ধর্ববিবাহ পুরাণে অমর হয়ে আছে। দুষ্মন্ত ভুলে গিয়েছিলেন শকুন্তলাকে, তার পর শকুন্তলাপুত্র সর্বদমন ওরফে ভরতকে নিয়ে যখন দুষ্মন্তের কাছে গেলেন তখন একটি অঙ্গুরীয় তাঁদের আবার মিলন ঘটায়। ভরতের নাম থেকে ভারত–এমন একটা কথা শোনা যায়।

যদুবংশের প্রেমিকপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কে সকলেই অবহিত। পুরু বা পৌরব বংশের শান্তনু, অর্জুন, ভীম– তাঁরাও প্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়েছেন বারবার। শান্তনু-মৎস্যগন্ধার প্রেম স্মর্তব্য। ভীম-গঙ্গার প্রেম এবং শান্তনু-হিড়িম্বার প্রেম, ভীমের সঙ্গে কালী ও বলন্ধরার প্রণয় মহাভারতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। অর্জুনের সঙ্গে ঊলূপী, চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রার প্রেম অমর হয়ে আছে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রেম করেছেন গোবাসনদুহিতা দেবিকার সঙ্গে-, বিবাহও হয়েছিল তাঁদের। তাঁদের একমাত্র পুত্র যৌধেয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রয়াত হন।

দ্রৌপদী মহাভারতের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রেমিকা। পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্মিনী হলেও তাঁর অধিক প্রেম ছিল অর্জুনের প্রতি। এমনকী এ কথাও তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে, ‘তথাপি মনো মে ষষ্ঠং প্রতি ধাবতি’– অথচ আমার মন ষষ্ঠ পানে ধায়। কে সেই ষষ্ঠ পুরুষ? তিনি হলেন কর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও কুন্তী কর্ণকে বলেছেন, ষষ্ঠকালে দ্রৌপদী তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। সূর্যপুত্র তাতে সাড়া দেননি। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দ্রৌপদীর বন্ধু, তাতে কোনও কাম বা প্রণয়ের গন্ধ ছিল না।

এ ছাড়াও আরো বহু কাহিনী আছে পুরাণের যেগুলো পুরাণের কাহিনীরূপে সংকলিত রূপক।পুরাণের প্রেম শাশ্বত,আদিম ও ধ্বংসরহিত ভাববন্ধন । সেখানে প্রেম শুধু পরিণয়ে আবদ্ধ থাকেনি, তা প্রতিষ্ঠা করেছে দার্শনিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক মিত্রতা এবং সাম্রাজ্যবিস্তার।

ভেবেছিলাম পাঁচটা পর্বে শেষ করতে পারব কিন্তু “নক্ষত্র কথা” শেষে এসে দেখলাম এটুকু না দিলেই নয়, তাই আরেকটা পর্ব বাড়লো “নক্ষত্র কথা” হল ছটা পর্ব।

তথ্যসূত্র শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ফলিত জ্যোতিষ : বিভিন্ন পুরাণ ও ইন্টারনেট।

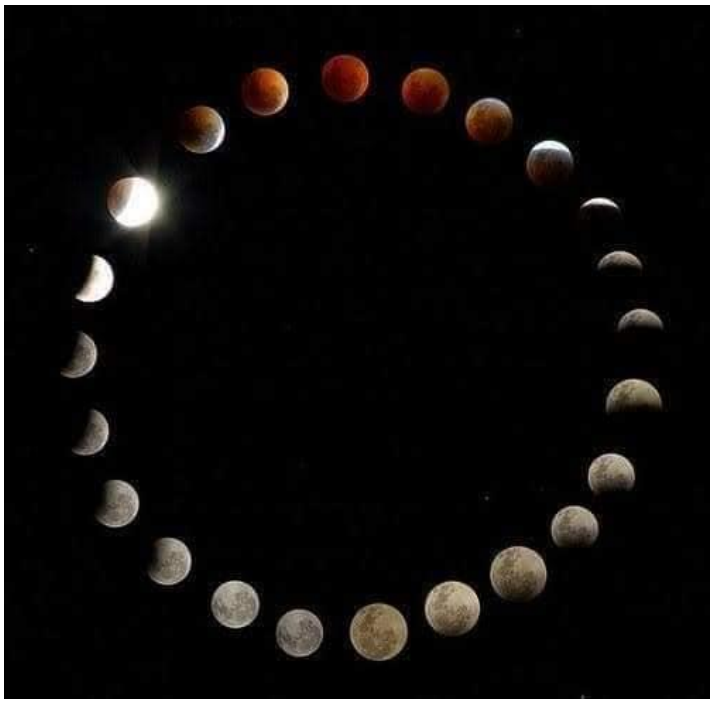

Gemini
Taurus
Cancer
Aries
Leo
Pisces
Virgo
Aquarius
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn

॥ষষ্ঠ ও অন্তিম পর্ব॥

তারায় তারায়

****

মহাকাশে অবস্থিত যে সকল বস্তু নিজের অভ্যন্তরে থাকা পদার্থকে জ্বালিয়ে ফিউশন বিক্রিয়া ঘটাতে পারে এবং আলোক উজ্জ্বল হয় তাদেরকে নক্ষত্র বলা হয়। এছাড়া তারা, তারকা বা নক্ষত্র বলতে মহাশূন্যে প্লাজমা দশায় অবস্থিত অতি উজ্জ্বল এবং সুবৃহৎ গোলাকার বস্তুপিণ্ডকেও বোঝায়। উচ্চ তাপে তারা নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমাগত নিজের জ্বালানি উৎপন্ন করে। নিউক্লীয় সংযোজন থেকে উদ্ভূত তাপ ও চাপ মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনকে ঠেকিয়ে রাখে। জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে একটি তারার মৃত্যু হয়ে শ্বেত বামন অথবা নিউট্রন তারা আবার কখনো কৃষ্ণ বিবরের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী হতে সবচেয়ে কাছের তারা হচ্ছে সূর্য। তারা জ্বলজ্বল করার কারণ হচ্ছে, এর কেন্দ্রে নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা তারার পুরো অভ্যন্তরভাগ পার হয়ে বহিঃপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত হয়। হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম অপেক্ষা ভারী প্রায় সকল মৌলই তারার কেন্দ্রে প্রথমবারের মত উৎপন্ন হয়েছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারার বর্ণালি, দীপন ক্ষমতা বা গতি পর্যবেক্ষণ করে এর ভর, বয়স, রাসায়নিক গঠন এবং অন্যান্য অনেক ধর্মই বলে দিতে পারেন। তারাটির সর্বমোট ভরই মূলত তার বিবর্তন এবং চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে দেয়। অন্যান্য ধর্মগুলো নির্ণয় করা হয় বিবর্তনমূলক ইতিহাসের মাধ্যমে যার মধ্যে রয়েছে ব্যাস, ঘূর্ণন, চাপ এবং তাপমাত্রা। অনেকগুলো তারার তাপমাত্রাকে তাদের দীপন ক্ষমতার বিপরীতে একটি লেখচিত্রে স্থাপন করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তাকে হের্টস্‌স্প্রুং রাসেল চিত্র বলা হয়। এই চিত্রের মাধ্যমেই তারার-বিবর্তনের বর্তমান দশা এবং এর বয়স নির্ণয় করা যায়।

ধ্বসে পড়ছে এমন একটি মেঘের মাধ্যমে তারার জীবনচক্র শুরু হয়। এই মেঘের মধ্যে থাকে মূলত হাইড্রোজেন, অবশ্য হিলিয়াম সহ অতি সামান্য বিরল ভারী মৌল থাকতে পারে। তারার কেন্দ্রটি যখন যথেষ্ট ঘন হয় তখন সেই কেন্দ্রের হাইড্রোজেন নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে হিলিয়ামে পরিণত হতে থাকে। তারার অভ্যন্তরভাগের অবশেষ থেকে শক্তি বিকিরণ এবং পরিচলনের এক মিশ্র প্রকিয়ায় বহির্ভাগে নীত হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো তারাকে ধ্বসে পড়তে দেয় না এবং উৎপন্ন শক্তি একটি নাক্ষত্রিক বায়ু তৈরি করে যা বিকিরণকে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। তারার মধ্যকার হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু ভরের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। অবশ্য মৃত্যু ঘটার আগে তারাটি আরও কয়েক প্রজন্ম পার করে যার মধ্যে রয়েছে অপজাত অবস্থা। প্রতি প্রজন্মে তার পূর্বের প্রজন্মের তুলনায় ভারী মৌলের পরিমাণ বেশি

থাকে। তারা নিঃসঙ্গ থাকতে পারে, আবার দুই বা ততোধিক তারা একসাথে একটি তন্ত্র গড়ে তুলতে পারে। দুটি হলে সাধারণত একে অন্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে এবং বেশি কাছাকাছি এসে গেল একে অন্যের বিবর্তনকেও প্রভাবিত করে।

ব্যুৎপত্তি

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

তারা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ স্টার শব্দটি গ্রিক অ্যাস্টার থেকে এসেছে যা আবার হিত্তীয় ভাষার শব্দ ।"স্টার" শিত্তার থেকে এসেছে। শিত্তার শব্দটিরব্যুৎপত্তি আবার সংস্কৃত শব্দ সিতারা।

পর্যবেক্ষণের ইতিহাস

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

প্রতিটি সংস্কৃতিতেই তারা বিশেষ গুরুত্ব বহন করতো। ধর্ম চর্চায় এর ব্যবহার ছিল সবচেয়ে বেশি। এছাড়া তারার মাধ্যমে নাবিকরা দিক নির্ণয় করতো এবং ঋতুর সাথে এর সম্পর্কটিও মানুষ অনেক আগে বুঝতে পেরেছিল। প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন, তারা স্বর্গীয় গোলকে নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ আছে এবং এরা অপরিবর্তনীয়। চলতি প্রথা অনুযায়ী তারা তারাগুলোকে কিছু তারামণ্ডলে ভাগ করেছিলেন এবং এই মণ্ডলগুলোর মাধ্যমে সূর্যের অনুমিত অবস্থান ও গ্রহের গতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতেন। তারার পটভূমিতে তথা দিগন্তে সূর্যের গতিকে ব্যবহার করে পঞ্জিকা তৈরি করা হতো যা কৃষিকাজে বিশেষ কাজে আসতো। বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পঞ্জিকা হচ্ছে জর্জীয় পঞ্জিকা। এই পঞ্জিকাটিও সৌরকেন্দ্রিক। সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের কোণগুলোর মাধ্যমে এই পঞ্জিকা নির্মিত হয়।

জানা মতে সঠিকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রাচীনতম পঞ্জিকা নির্মাণ করেছিল প্রাচীন মিশরীয়রা, ১,৫৩৪ খ্রিস্টপূর্বে। ইসলামী জ্যোতির্বজ্ঞানীরা অনেক তারার আরবি নাম দিয়েছিলেন যার অনেকগুলো এখনও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তারা তারার অবস্থান নির্ণয়ের জন্য প্রচুর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে আবু রাইহান আলবিরুনি আকাশগঙ্গা- ছায়াপথ বিপুল সংখ্যক ভগ্নাংশের সমন্বয়ে গঠিত বলে ব্যাখ্যা করেন। এর ভগ্নাংশগুলোর নীহারিকময় তারার মত ধর্ম রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ১০১৯ সালের এক চন্দ্র গ্রহণের সময় তিনি বিভিন্ন তারার অক্ষাংশও নির্ণয় করেছিলেন।

তারাকে স্বর্গীয় অপরিবর্তনীয় বস্তুরূপে কল্পনা করলেও চৈনিক জ্যোতির্বিদরা বুঝতে পেরেছিলেন, নতুন তারার উদ্ভব হতে পারে। টাইকো ব্রাহের মত আদি ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা রাতের আকাশে নতুন তারার উদ্ভব দেখতে পান। এ থেকে তারা প্রস্তাব করেন, স্বর্গ অপরিবর্তনীয় নয়। ১৫৮৪ সালে জর্দানো ব্রুনো বলেন,

তারাগুলো মূলত অন্যান্য সূর্য যাদের পৃথিবীর মত বা একটু অন্যরকম গ্রহও থাকতে পারে। গ্রহগুলো যার যার সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই ধারণাটি এর আগে গ্রিক বিজ্ঞানী দিমোক্রিতুস এবং এপিকিউরাস ও ব্যক্ত-করেছিলেন। এর পরের শতাব্দী জুড়ে তারাগুলোকে অনেক দূরের সূর্য হিসেবে কল্পনা করার বিষয়টি বিজ্ঞানীদের মধ্যে জনপ্রিয় হতে থাকে। তারাগুলো কেন সৌর জগৎকে মহাকর্ষীয় টানের মাধ্যমে প্রভাবিত করে না তা ব্যাখ্যা করার জন্য আইজাক নিউটন বলেন, তারা আসলে মহাবিশ্বে সমানভাবে বন্টিত। ধর্মতাত্ত্বিক রিচার্ড বেন্টলি সমরূপতার এই ধারণাটি প্রথম উল্লেখ করেছিলেন।

ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেমিনিয়ানো মোন্তানারি ১৬৬৭ সালে আলগল নামক তারার জ্যোতির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন। এডমন্ড হ্যালি সর্বপ্রথম আমাদের কাছাকাছি অবস্থিত এক জোড়া স্থির তারার সঠিক গতি পরিমাপ করে তা প্রকাশ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি দেখান প্রাচীন গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি এবং হিপ্পার্কুসের সময়ে এটি যে অবস্থানে ছিল, এখন সেখানে নেই। পৃথিবী থেকে একটি তারার দূরত্ব প্রথম সঠিকভাবে পরিমাপ করেন ফ্রিডরিক বেসেল, ১৮৩৮ সালে। লম্বন কৌশল ব্যবহার করে তিনি এই দূরত্ব পরিমাপ করেছিলেন। তিনি পৃথিবী থেকে ৬১ সিগনি নামক তারাটির দূরত্ব ১১ আলোকবর্ষ নির্ণয় করেছিলেন। ৪. লম্বন পরিমাপের মাধ্যমেই বোঝা গিয়েছিল স্বর্গীয় স্থির তারাগুলো আসলে একে অপর থেকে কতো দূরে দূরে অবস্থান করছে।

উইলিয়াম হার্শেল প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানী যিনি আকাশে তারার বণ্টনের সঠিক তাৎপর্য উদ্ধারে ব্রতী হন। ১৭৮০'র দশকে তিনি ৬০০টি ভিন্ন ভিন্ন দিকে এক বিশেষ পরিমাপ সম্পন্ন করেন। প্রতিটি দৃষ্টিরেখায় অবস্থিত তারার সংখ্যা পরিমাপ করে ফলাফলগুলো একত্রিত করেন। এ থেকে তিনি বের করেন, আকাশের একটি বিশেষ দিকে তারার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আর এই দিকটি হলে আকাশগঙ্গার কেন্দ্রের দিক। তার আবিষ্কার থেকে তিনি এও মন্তব্য করেন যে, কিছু কিছু তারা যে কেবল এক দৃষ্টিরেখায় আছে তাই নয়, ভৌতভাবে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিতও থাকতে পারে। এ কারণেই যুগল তারা ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

নাক্ষত্রিক বর্ণালিবিক্ষণ বিজ্ঞানের উন্নয়ন ঘটান Joseph von Fraunhofer এবং Angelo Secchi। তারাসমূহের বর্ণালীর তুলনা করে তারা তাদের শক্তি এবং তাদের বর্ণালীতে উপস্থিত বিশোষণ রেখার সংখ্যায় পার্থক্য দেখতে পান। বিশোষণ রেখা বলতে নাক্ষত্রিক বর্ণালিতে উপস্থিত এমন সব কালো রেখাকে বোঝায়, তারাটির পরিবেশে আলোর নির্দিষ্ট কিছু কম্পাঙ্কের শোষণের কারণে যার সৃষ্টি হয়। ১৮৬৫ সালে Secchi তারাগুলোকে বর্ণালী ধরনে বিভক্ত করা শুরু করেন। অবশ্য নাক্ষত্রিক শ্রেণীবিভাগের আধুনিক সংস্করণটির উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন অ্যানি জে ক্যানন, বিংশ শতাব্দীতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুগল তারা নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৪ সালে ফ্রিডরিক বেসেল লুব্ধক তারার প্রকৃত গতিতে বিবর্তন লক্ষ করেন এবং এর একটি গুপ্ত সাথী রয়েছে বলে সিদ্ধান্তে আসেন।

বৈশিষ্টসমূহ

******

তারার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টসমূহ যেমনঃ আকার, উজ্জ্বলতা, বিবর্তন, জীবনচক্র এবং সবশেষে তারার পরিনতি এ-সব কিছুই এর প্রাথমিক ভরের উপর নির্ভর করে।

বৃহত্তম তারকা

****

(UF Scuti ইউ ওয়াই স্কিউটি) মহাবিশ্বের বৃহত্তম তারকা। এটি আমাদের সূর্যের চেয়ে ১,০০০ গুণের চেয়েও বেশি প্রশস্ত। এটি একটি লাল মহাদানব (Red Supergiant)।

বয়স

***

অধিকাংশ তারার বয়স ১০০ কোটি থেকে ১০০০ কোটির মধ্যে। কিছু তারার বয়স ১৩,৭০ কোটির কাছাকাছি, যা আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বয়সের সমান।এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত পুরাতন তারা HE1523-0901 এর গননাকৃত বয়স ১,৩২০ কোটি বছর। তারার আকার যত বড় হয় এর আয়ূকাল ততই কমে যায়। কেননা, বৃহদকার তারার কেন্দ্রের চাপ বেশি থাকে এবং এই চাপের সমতার জন্য এর হাইড্রোজেন দ্রুত পুড়ে নিঃশেষ হয়। আধিকাংশ বৃহদকার তারার আয়ূকাল গড়ে প্রায় ১০ লক্ষ বছর হয়। আপেক্ষাকৃত কম ভরের তারার যেমন) ১ জ্বালানি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয় এবং এদের আয়ূকাল (লাল বামন নক্ষত্র,০০০ কোটি থেকে লক্ষ কোটি বছর হয়।

তারকার প্রকারভেদ

****

বিভিন্ন ধরনের তারকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে মেইন সিকোয়েন্স-তারকা। মহাবিশ্বে তারকাদের ৮০ ভাগই এই শ্রেণির।তারকাদের মধ্যে মূলত এরাই হাইড্রোজেন জ্বালিয়ে হিলিয়াম উৎপন্ন করে এবং একই সাথে

তৈরি করে বিপুল পরিমাণ আলো ও তাপ। এই তারকাদের হাইড্রোজেন জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে তখন এদের নাম হয় দানব নক্ষত্র। কারণ, তখন বিকিরণের চাপে এদের ব্যাসার্ধ বেড়ে যায়। আরো ৫ বিলিয়ন বছর পর আমাদের সূর্য এই দশায় পৌঁছবে। পরবর্তীতে ভরভেদে এরা নিউট্রন তারা, পালসার বা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দুটি তারকা তাদের সাধারণ ভরকেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। এদেরকে বলা হয় বাইনারি তারকা। মহাবিশ্বে ৫০ ভাগ তারকাই এই শ্রেণির।

তারামণ্ডল :ইংরেজি)Constellation) পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান মহাকাশ বা আকাশের ৮৮টি ভাগের যেকোন একটি ভাগের নাম। আধুনিক কালে সমগ্র খ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যার প্রতিটিতে বিভিন্ন৮৮ কে-গোলক-তারাসমূহ অবস্থান করে। মাঝেমাঝে এই শব্দটি কিছুতারার সমষ্টি বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। কিছু তারা মিলে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করলে তাকে তারামণ্ডল হিসেবে অভিহিত করা হতো অনেক কাল আগে থেকেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এই তারামণ্ডলসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। এর মধ্যে টলেমির পদ্ধতিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে বর্তমানে ৮৮টি ভাগের অস্তিত্বকেই ধ্রুব ধরা হয়। যে তারামণ্ডলগুলো বেশ পরিচিত সেগুলোতে এমনকিছু উজ্জ্বল তারা থাকে যারা একটি সুস্পষ্ট কাঠামো গঠন করে। অবশ্য বেশির ভাগ মণ্ডলগুলোর তারাই ক্ষীণ।তারামন্ডল অপর নাম হলো ।"নক্ষত্রমন্ডলী"

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন টি ভাগে ভাগ করেছে যার প্রত্যেকটির৮৮ আকাশকে (আইএইউ) রয়েছে সুস্পষ্ট সীমারেখা। এর ফলে এখন পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান মহাকাশের প্রতিটি স্থানই কোন না কোন গোলকের উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত তারামণ্ডলসমূহের নামকরণ ও বিভাগ মূলত-তারামণ্ডলের মধ্যে পড়ে। খ প্রাচীন গ্রিক প্রথা অনুসারেই করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভাবও এতে রয়েছে। এছাড়া রাশিচক্রের চিহ্নসমূহও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৩০ সালে ইউজিন ডেলপোর্টে প্রথম তারামণ্ডলসমূহের সীমারেখা চিহ্নিত করেন; একই সাথে তিনি বিষুবাংশ এবং বিষুবলম্বের রেখাসমূহের সাপেক্ষে এই সীমারেখাগুলো চিহ্নিত করেন। তিনি অবশ্য বি১৮৭৫ ইপকের ০. জন্য এই সীমারেখাগুলো চিহ্নিত করেছিলেন। তখনকার সময়ে বেঞ্জামিন এ গউল্ড একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন . যার ভিত্তিতে ডেলপোর্টে তার কাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এতো আগের সময়ের জন্য সীমারেখা চিহ্নিতকরণের ফলে যা হয়েছে তা হল; বিষুবন বিন্দুসমূহের অয়নচলনের জন্য একটি আধুনিক তারা চিত্রে এই সীমারেখাগুলো অনেকটা বেঁকে যায় যার ফলে আর তা সমান্তরাল বা উল্লম্ব (ইপকের জন্য ২০০০উদাঃ জে) থাকে না। যত সময় যাবে এই বেঁকে যাবার পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে।

আকাশের তারা সম্পর্কে যাদের জানাশোনা কম, তাদের কাছেও অতি পরিচিত হল আকাশে সারিবাঁধা তিনটি তারা। সেই প্রাচীনকাল থেকেই এই তিনটি তারা নিয়ে মানুষের আগ্রহের সীমা নেই। তখন থেকেই এই তিনটি তারকাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক গল্প। পরে আস্তে আস্তে মানুষ যখন আকাশে কালপুরুষের ছবি তৈরি

করলো তখন দেখা গেল সারিবাঁধা এই তিনটি তারা রয়েছে কালপুরুষের কোমরবন্ধে। পূর্ব আকাশে, লুব্ধকের সামান্য উত্তর পশ্চিমে, তিনটি তারা এক সরল রেখায় উত্তর পশ্চিম থেকে পূর্ব দক্ষিণে এক সঙ্গে সারিবেঁধে-পরপর থাকতে দেখা যায়। এই তিনটি তারাকে কালপুরুষের কোমরের বেল্ট বা কোমরবন্ধ বলা হয়ে থাকে। এর দক্ষিণে এবং উত্তরেও দুইটি করে অপেক্ষাকৃত চারটি বড় তারা দেখা যায়। যা হোক, সারিবাঁধা এই তিনটি তারা মানুষ পৃথিবীতে আসার প্রথম দিক থেকেই দেখে আসছে। ভাষা আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিভিন্ন সভ্যতার মানুষ বিভিন্নভাবে এদের নামকরণ করে। এই তিনটি তারার ওপরের তারাকে গ্রিক ভাষায় ডাকা হয় 'ডেলটা ওরিওনিস' নামে। এর বাংলা নাম 'চিত্রলেখা', আরবি 'মিনতাকা'। মাঝেরটিকে বলা হয় 'এফসাইলন ওরিওনিস'। এর বাংলা নাম 'অনিরুদ্ধ', আরবি 'আলনিলাম'। এবং সর্বদক্ষিণে সারির নিচের তারাটির নাম 'জিটা ওরিওনিস'। এর বাংলা নাম 'ঊষা', আরবি 'আলনিতাক'।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন বর্তমানে কালপুরুষ মণ্ডলের যে ছবি কিংবা আকৃতি আমরা আকাশে দেখতে পাই, তা আজ থেকে প্রায় ১৫ লাখ বছর আগে গঠিত হয়েছিল। এবং পৃথিবীর সাপেক্ষে এই কালপুরুষের তারাগুলোর গতি কম হওয়ায় আরো প্রায় দশ থেকে বিশ লাখ বছর পর্যন্ত এটি দেখা যাবে। এই হিসাবে পৃথিবীর আকাশে তারকাদের বিভিন্ন মণ্ডলের মধ্যে কালপুরুষই সবচেয়ে বেশিদিন দৃশ্যমান থাকবে বলে ধারণা করা হয়। এই বিষয়টি সারিবাঁধা তিনটি তারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন কালপুরুষের থেকেও এদের স্থায়িত্ব আরও অনেক বেশি দিনের। কারণ এরা সবাই ই সূর্যের থেকে বহুগুণে বড়। তবে আকাশে-সারিবাঁধা এই তিনটি তারার ঔজ্জ্বল্য এক রকম নয়। এই তিনটি তারার মধ্যে সবচেয়ে ওপরের তারা মিনতাকা বা চিত্রলেখা পৃথিবীর আকাশ থেকে সবচেয়ে ছোট দেখা যায়। তবে মজার বিষয় হল এটি একক কোনো তারা নয়, বড় টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে একটি আবছা তারাগুচ্ছের অঞ্চল চোখে পড়ে এখানে। আর তখন এই জায়গাটিতে স্পষ্টভাবে দুইটি তারা দেখা যায়। যে কারণে এই তারাটিকে অনেকে জোড়া তারাও বলে থাকেন, যদিও খালি চোখে এটিকে একটি তারাই মনে হয়। এই দুইটি তারার মধ্যে একটি বড় আর অন্যটি বেশ ছোট। ছোট তারাটি বড় তারাকে কেন্দ্র করে ঘুরে থাকে। এই বিষয়টি নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলে থাকেন দুইটি তারাই পরস্পর পরস্পরকে কেন্দ্র করে ঘুরে থাকে। এই দুইটি তারা পরস্পর প্রতি ৫সালে জনাথন হার্টম্যান তারা দুটির ১৯০৪ দিনে একে অপরকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ৭৩. মাঝে একটি গ্যাসের চিকন বলয় আবিষ্কার করেন। পৃথিবী থেকে ১২০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত মিনতাকা বা চিত্রলেখার এই দুইটি তারাকে একসঙ্গে ছোট এবং অনুজ্জ্বল মনে হলেও এরা আসলে সূর্যের তুলনায় বহুগুণ উজ্জ্বল এবং সূর্যের তুলনায় এদের ভরও অনেক বেশি।

উজ্জ্বলতার দিক থেকে তিনটি তারা মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হল মাঝের তারা আলনিলাম বা অনিরুদ্ধ তারা। খেয়াল করলে দেখলে দেখা যাবে এই তারাটির রঙ গাড় নীল, যে কারণে আরবরা এর নাম রেখেছিল আলনিলাম। এই আলনিলাম শব্দের অর্থ হল নীলকান্তমণি। ইংরেজিতে একে বলা হয় ব্লু সুপার জায়েন্ট স্টার।

বর্ণালী এবং উজ্জ্বলতা হিসাব করে দেখা গেছে এটি সূর্যের তুলনায় প্রায় ৩৪ গুণ ভারী এবং পৃথিবীর আকাশের ৬. আলোকবর্ষ। একমাত্র ধ্রুবতারা বাদে সূর্যের মতো ২০০০ তম উজ্জ্বল তারা। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায়২৯ আকাশের অন্য তারারাও তাদের স্থান ত্যাগ করে। এই তারাটিও স্থান বদলাতে বদল:োতে প্রতি বছরের ডিসেম্বরের পনের তারিখে আকাশের সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছায়। আগের কালের মানুষেরা এই সময়টাকে শুভ সময় হিসেবে বিবেচনা করতো। তারা মনে করতো নীল রঙের তারা আকাশের মধ্যে চলে আসার সময়টা সৌভাগ্যের, যে কারণে এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের আচার তারা পালন করতো। ধারণা করা হয় অনিরুদ্ধ তারার বর্তমান বয়স ৫ মিলিয়ন বছর। এবং এখনো প্রায় দশ লাখ বছরের বেশি সময় এটির বর্তমান অবস্থা চলবে ৭. এবং তারপর এটি রেড সুপারজায়েন্ট তারায় রুপান্তিত হয়ে সুপারনোভা হয়ে বিস্ফোরিত হয়ে নিভে যাবে। সারিবাঁধা তিনটি তারার সর্বশেষ অর্থাৎ সর্বদক্ষিণে সারির নিচের তারাটির হল ‘ঊষা’ বা ‘আলনিতাক’। আরবি আলনিতাক শব্দের অর্থ হল দল। আলতিনাকের উজ্জ্বলতাও আলনিলামের কাছাকাছি। আয়তনে এই তারাটি আলনিলামের থেকে বেশ ছোট, কিন্তু আলনিলামের মতো প্রায় সমান উজ্জ্বলতা দেখানোর কারণ হল এটি পৃথিবী থেকে আলনিলাম অপেক্ষা বেশ কাছে অবস্থিত। এই তারার অঞ্চলের অবস্থান পৃথিবী থেকে প্রায় ৮০০ আলোকবর্ষ দূরে। আগে এটিকে একক তারা হিসেবে মনে করা হলেও ১৯৯৮ সালে আবিষ্কৃত হয় আসলে এখানেও দুইটি তারা অবস্থিত। যার একটি ব্লু জায়েন্ট নক্ষত্র, তখন এটির নাম দেওয়া হয় ‘আলতিনাক এ’। এটি সূর্য থেকে প্রায় ২০ গুণ বড়। এছাড়া অপর তারাটি বেশ অনেকটা ছোট। এটিকে ডাকা হয় নীল বামন তারা বা ‘আলতিনাক বি’ নামে। এই ছোট তারাটি বড় তারাকে কেন্দ্র করে ঘুরে থাকে। এটি ‘আলতিনাক এ’ কে কেন্দ্র করে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় ১৫০০ বছর। ধারণা করা হয় আলনিতাকের তারাদের বর্তমান বয়স প্রায় ৭ মিলিয়ন বছর। সারিবাঁধা এই তিনটি তারা ছাড়াও মহাকাশে আরো অনেক তারা রয়েছে যারা সূর্যের তুলনায় বহুগুণে বড় এবং উজ্জ্বল। কিন্তু পৃথিবীর আকাশ থেকে আমরা খালি চোখে সেটা বুঝতে পারিনা। এর কারণ হল দূরত্ব এবং আমাদের চোখের জ্যোতি। যে কারণে সাধারণ চোখে পাঁচটি তারাকে যেমন তিনটি তারা হিসেবে সহজেই যেমন বিশ্বাস করে ফেলি তেমন মহাবিশ্বে অনেক কিছুই রয়েছে যেগুলো কল্পনার মধ্যেও নেই। বস্তুত এর পরিমাণই বেশি।

নক্ষত্র ও গ্রহের পার্থক্য

****

নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল

1. সৃষ্টি: নক্ষত্র সৃষ্টির সময় মহাবিশ্ব: ধূলিকণা ও গ্যাসের মহাজাগতিক মেঘ বা নীহারিকা থেকে প্রকাণ্ড আকারের জ্বলন্ত নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়।

গ্রহনক্ষত্র সৃষ্টি পর :, মহাবিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্র

থেকে বিভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি হয়।

2. আলাে ও তাপ:

নক্ষত্রনক্ষত্রদের নিজস্ব আলাে ও তাপ রয়েছে। নক্ষত্রগুলি নিউ :ক্লিয় বিভাজনের মাধ্যমে আলাে ও তাপের উৎপত্তি ঘটায়।

|

গ্রহগ্রহদের নিজস্ব আলাে ও তাপ নেই :, এরা নক্ষত্রের আলাে্য় আলাে্কিত ও উত্তপ্ত হয়।

3. আলাে্র প্রকৃতি:

নক্ষত্রনক্ষত্ররা আকাশে মিটমিট করে জ্বলে। :

গ্রহনক্ষত্রের আলাে্য় আলাে্কিত হয় বলে গ্রহদের আলাে স্থির। :

4. গঠন;

নক্ষত্রনক্ষত্র গুলি হয় বৃহৎ আকারের জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। :

গ্রহগ্রহ গুলি হয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের শীতল ও কঠিন ঘনবস্তু। :

5. অবস্থান:

নক্ষত্রনক্ষত্রগুলি আপাততভাবে স্থির থাকে। ফলে নক্ষত্রদের পারস্পরিক দূরত্ব সব সময় একই থাকে। :

গ্রহগ্র :হগুলি কোন নক্ষত্রের চারিপাশে প্রদক্ষিণ করে থাকে।ফলে গ্রহদের নিজস্ব দূরত্বের বৃদ্ধি ঘটে।

6. ক্ষেত্রমান:

নক্ষত্রনক্ষত্রগুলি তুলনামূলক ক্ষেত্রমানে অনেক বড় হয়। :

গ্রহগ্রহগুলি ক্ষেত্রমানে নক্ষত্রের তুলনায় ছাে্ট ভাই হয়। :

7. বয়স:

নক্ষত্র উৎপত্তি অনুসারে :নক্ষত্রগুলি গ্রহদের তুলনায় বয়সে প্রাচীন।

গ্রহউৎপত্তি অনুসারে গ্রহগুলি নক্ষত্রের তুলনায় বয়সে নবীন হয়। :

৪:কক্ষপথ .

নক্ষত্রনক্ষত্রের নিজস্ব কক্ষপথের পরিধি অতি বিশাল হয়ে থাকে। :

গ্রহগ্রহগুলি নিকটবর্তী নক্ষত্রদের পরিক্রমণ করে বলে :, এদের কক্ষপথের পরিধি তুলনামূলক অনেক ছাোট হয়।

স্থুল মানব দেহভাণ্ড ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।-

মানবদেহ এক বিস্ময়। কত যে কারিকুরি আছে এই দেহে, তার ইয়ত্ত্বা নেই। বিজ্ঞান এখনো দেহের সমস্ত অঙ্গের কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত নয়। আবার আমাদের এই স্থুল দেহই চৈতন্যের আবাসস্থল। তাই আমাদের এই মনুষ্য জীবন ও মানুষের এই স্থূল দেহ আমাদের সাধনার মূল আশ্রয়। বহু জন্ম অতিক্রান্ত করে, লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর আমরা এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছি। একমাত্র মনুষ্যদেহেই আমাদের কর্ম্মফল সঞ্চিত হয়। তাই আমরা সবাই আবার মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত করতে চাই।

মনুষ্যদেহ ভিন্ন সাধন সম্ভব নয়। তাই মানব জীবন আমাদের কাছে, অতি মূল্যবান। আমাদের এই দেহকে ভালো করে জানতে হবে। আমরা জানি আমাদের এই দেহ কতকগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমাহার মাত্র । এই দেহকে-শারীরবিদগন এক রকম ভাবেই দেখেছেন। অধ্যাত্ম পথের পথিকরা এই দেহকে অন্য ভাবে দেখেছেন। তারা মনে করেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ একটি ব্রহ্মান্ড, হচ্ছে আমাদের এই দেহ । আমরা আজ সেই কথাই শুনবো।

বাউল লালন ফকির বলছেন :

দেবজন্ম নিতে মানবে।।এমন মানব জনম আর কী হবে। / করে আরাধন / দেবতাগন-

কত ভাগ্যের ফলে না জানি মন রে পেয়েছো এই মানব তরণী। /

বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায় যেন ভারা / না ডোবে।।

এই মানুষে হবে মাধুর্যতাইতো মানুষরূপ গড়লে নিরঞ্জন। / ভজন-

এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার অধীন লালন তাই ভাবে।। /

বেশিরভাগ ধর্ম্মপ্রান মানুষ অল্পবিস্তর যোগের ক্রিয়া করে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের সাধনকেন্দ্র এই দেহ। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন, মুসলমান, সবাই কিছু না কিছু শারীরিক ক্রিয়া অবশ্যই করে থাকেন। অর্থাৎ দেহের মাধ্যমেই আমাদের সাধন ভজন। আমরা সবাই মনে করি, ঈশ্বর যেমন বাইরে আছেন বৃহৎ আকারে, তেমনি

আমাদের দেহে আছেন সূক্ষ্ম আকারে। এই দেহের মধ্যেই আছেন পরমতত্ত্ব, বা পরমাত্মা। দেহের বাইরে যেমন আছে পঞ্চতত্ত্ব, সপ্তলোক, নদী, সাগর, দ্বীপ, পর্বত। তেমনি আমাদের শরীরকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে কল্পনা করা হয়েছে। তাইতো একটা প্রচলিত কথা আছে যে, যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে এই দেহভান্ডে।-

আমরা জানি আমাদের মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে, ছটি চক্র আছে। এর মধ্যে সবথেকে নিচে, যে মূলাধার চক্র আছে সেখানে কুণ্ডলিনী শক্তি, অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি সুষুপ্ত অবস্থায় আছেন। এই কুণ্ডলিনীকে প্রাণ অপান বায়ুর-সাহায্যে ক্রিয়া দ্বারা জাগ্রত করে, সুষুম্নার ভিতর দিয়ে উর্দ্ধগতি করাতে পারলে, সেই বায়ু সূক্ষ্ম অবস্থায় সহস্রারে অর্থাৎ পরমশিবের সাথে মিলিত হন । মানুষ তখন, ত্রিগুণাতীত ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করতে পারেন ।

তাই দেহকে অবলম্বন করেই সাধনা। তা সে হিন্দু, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, যোগী, বৈষ্ণব, বাউল, সুফি, যাই বলুন না কেন, সবাই এই দেহকে অবলম্বন করেই সাধনা করছেন। আমরা সবাই জানি, পঞ্চভূতের এই দেহ। এই পঞ্চভূত কি ভাবে আমাদের দেহে অবস্থান করছেন দেখুন।

ক্ষিতি অর্থাৎ কঠিন পদার্থ বা পৃথিবী আমাদের শরীরে :, অস্থি, চর্ম, নাড়ী, লোম ও মাংস এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ, বা বিকার অবস্থা।

অপ অর্থাৎ তরল পদার্থ বা জল মল :, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা ও শোনিত এই পাঁচটি হচ্ছে জলের গুণ । -

তেজ অর্থাৎ তাপ বা অগ্নি ক্ষুধা :, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মোহ, ক্ষান্তি এই পাঁচটি হচ্ছে তেজের গুণ । - (ক্ষমা বা তিতিক্ষা)

মরুৎ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ বা বাতাস : বিরোধ, আক্ষেপন, আকুঞ্চন, ধারণ ও তৃপ্তি এই পাঁচটি হচ্ছে বায়ুর - গুণ।

ব্যোম অর্থাৎ বিশাল বা আকাশ রাগ :, দ্বেষ, মোহ, ভয় ও লজ্জা এই পাঁচটি হচ্ছে আকাশের গুণ । -

পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ু প্রধান। তাই আমরা বায়ু সম্পর্কে এবার আমরা আরো একটু গভীরে যাবো। বায়ু দশ রকম বা বায়ুর দশটি গুণ - প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এগুলো অর্থাৎ এই পা)ঁচটি আমরা জানি এছাড়া (আছে, নাগ, কূর্ম, কৃকর অর্থাৎ কয়ার পাখি, দেবদত্ত যিনি ধনকে জয়) ও ধনঞ্জয় (দেবতাদের কর্তৃক প্রদত্ত) এই মোট দশটি বায়ুর গুণ । প্রাণবায়ু আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত। অপান আমাদের গুহ্যদেশে। ।(করেছেন নাভিদেশে আছে সমান, কণ্ঠে উদানবায়ু, এবং সর্বশরীরে ছড়িয়ে আছে ব্যানবায়ু। এই পাঁচটি বায়ু প্রধান। নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় ৭২০০০ এগুলো আমাদের নাড়ীতে অবস্থান করে। অর্থাৎ আমাদের শরীরে যে - নাড়ী আছে, তার মধ্যে অবস্থান করে। তবে প্রধানত পাঁচটি নাড়ী অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ্যা ও চিত্রাণি

এই পাঁচটি নাড়ীতে অবস্থান করে। কেউ কেউ বলে থাকেন, ললাট, উরঃ, স্কন্ধ, হৃদয়, নাভি, ত্বক ও অস্থিতে এই পাঁচ নাগাদি বায়ু অবস্থান করে।

আমরা যে সাতটি তল ও লোকের কথা জানি, সেগুলোর অবস্থান এই রকম :

লোক ভূর্লোক: নাভিদেশে, ভুবর্লোক হৃদয়ে, স্বর্লোক আমাদের কণ্ঠে, মহর্লোক আমাদের চক্ষুদ্বয়ে। ভ্রূদ্বয়ে আমাদের জনলোক, ললাটে তপোলোকে, সহস্রারে সত্যলোক।

তলতল সাতটি।: তাদের অবস্থান এই রকম পাদের আধোভাগ হচ্ছে অতল :, পাদের উর্ধভাগ হচ্ছে বিতল।জানুদ্বয়ে সুতল, সন্ধিরন্ধ্রে হচ্ছে তল-, গুহ্যমধ্যে তলাতল, লিঙ্গমূলে রসাতল,পাদের অগ্রভাগ ও কটির সন্ধিস্থলে পাতাল।-

পর্বত আমাদের মূলাধার চক্রে একটা ত্রিকোণ কল্পনা করা হয়েছে। এটি পর্বতের বিশেষ অবস্থান কেন্দ্র।: ত্রিকোণের উর্দ্ধকোনে মন্দর পর্বত। ডানকোনে কৈলাশ পর্বত। বামকোনে হিমালয়। এছাড়া ত্রিকোণের উর্ধভাগে বিন্ধ্য ও বিষ্ণু পর্বত। এছাড়া আছে ত্রিকোণে মেরু পর্বত। এই মোট সাতটি পর্বতের অবস্থান কেন্দ্র।

দ্বীপ আমাদের দেহের অস্থিতে অবস্থান করছে জম্বুদ্বীপ:, মাংসে কুশদ্বীপ, শিরা সমূহে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, রক্তে আছে শাকদ্বীপ। আমাদের শরীরের উর্ধভাগে সমস্ত সন্ধিদেশে শাম্বলি দ্বীপ, লোমপূর্ন স্থানে প্লক্ষদ্বীপ এবং নাভিতে পুস্কর দ্বীপ।

সমুদ্র লবন সমুদ্র আমাদের মূত্র। শুক্র হচ্ছে ক্ষীরোদসাগর। মজ্জা হচ্ছে দধিসাগর। চর্ম হচ্ছে ঘৃতসাগর। বসা: অর্থাৎ আমাদের অবস্থিতি বা আধার হচ্ছে জল সাগর। কটিরক্তে ইক্ষুসাগর। এবং শোনিতে সুরাসাগর অবস্থিত।

গ্রহ নাদচক্রে সূর্য অবস্থিত। ব:িন্দুচক্রে চন্দ্র। মঙ্গল আছে আমাদের চক্ষুতে। হৃদয়ে আছে বুধ। পেটে বা উদরে আছে বৃহস্পতি। শুক্রে আছে শুক্রগ্রহ। নাভিচক্রে শনি, মুখে আমাদের রাহু আর নাভিতে কেতু।

ঈশ্বরের প্রকাশ স্বরূপ এই ব্রহ্মান্ড। আর এই ব্রহ্মান্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ হচ্ছে আমাদের এই মানবদেহ। এর মূল্যশুধু অসীম নয়, এটি একটি দুর্লভ বস্তূ। আমরা কেবল বাইরে আমার স্বামীকে খুঁজছি। স্বামীতো ঘরেই আছেন। অশরীরী আমাদের শরীরেই লুকিয়ে আছেন। এই দেহের মধ্যেই গঙ্গা যমুনা। এখানেই মিলনক্ষেত্র গঙ্গাসাগর।- এখানেই প্রয়াগ, হরিদ্বার, বারাণসী। এটাই তীর্থক্ষেত্র। এটাই পীঠস্থান। রত্নসার বলছে :

ভান্ডকে জানিলে জানি ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব।

ভান্ড বিচারিলে জানি আপন মাহাত্ম।

বহু ধর্মমতে আমাদের এই দেহের মধ্যেই ঈশ্বরের বাসস্থান কল্পনা করা হয়েছে। এটা শুধু কল্পনা নয়, এটি বাস্তব সত্য। প্রথম দিকে এই কল্পনা নিয়ে এগুতে হয়। ক্রমে ক্রমে এই সত্য সাধকের উপলব্ধিতে আসে। এমনকি কিছু কিছু সূক্ষ্মতত্ত্ব সামনে আসে, যখন মনে ঈশ্বর সম্পর্কে দৃঢ়তা আসে। এমনকি ঈশ্বরের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। সমস্ত সাধনাই আত্মউপলব্ধির সাধনা। এবং একমাত্র দেহকে অবলম্বন করেই আমরা স্থূল থেকে সূক্ষ্মে অগ্রসর হয়ে, সবশেষে আত্মার স্বরুপত্বে পৌঁছানো যায়। স্থুল থেকে সূক্ষ্মে অগ্রসর হওয়া মানে, সৃষ্টিধারার বিপরীত গতিতে অগ্রসর হওয়া। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন দুটো ভাবে হতে পারে, এক যদি পরমাত্মা স্বেচ্ছায় জীবাত্মার কাছে আসেন, আর জীবাত্মা যদি তার গতি পরমাত্মমুখী করেন। তো দেহের সাধন দ্বারা মানুষের সহজাত স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করা। এই অবস্থাতেই মানুষ ব্রহ্মস্বরূপত্ত্ব লাভ করে। তাই তন্ত্রমতে চক্রভেদ-, বা পাতঞ্জল মতে অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস, বেদান্তের পঞ্চকোষ-বিবেক সাধন, বৌদ্ধদের কায়বাদ-, বৈষ্ণবদের ভক্তিসাধন, বাউলদের সহজিয়া সাধন, মূলত একই পথের প্রকারভেদ মাত্র। তাই লালন বলছেন,

একবার আপনারে চিনলে,

পরে যায় অচেনারে চেনা।

শেষ করি ফকির লালন সাঁইয়ের পদ দিয়ে যেখানে সাধন প্রকরণ কিরকম হলে সপ্ততলা ভেদ করা যাবে তা বলা আছে :

সপ্ততলা ভেদ করিলে
হাওয়ার ঘরে যাওয়া যায়।
হাওয়ার ঘরে গেলে পরে
অধর মানুষ ধরা যাই॥
হাওয়াতে হাওয়া মিশায়ে
যাওরে মন উজান বেয়ে
জলের বাড়ি লাগবে নারে
যদি গুরুর দয়া হয়॥
গুরু পদে যার মন ডুবেছেরে
সে কি ঘরে রইতে পারে
রত্ন থাকে যত্নের ঘরে
কোন সন্ধানে ধরবি তাই।।
মৃণালের পর আছে স্থিতি

রূপের ছটা ধরবি যদি
লালন কয় তার গতাগতি
সেইখানে চাঁদ উদয় হয়॥

সমাপ্ত

তথ্য সহায়তা-

* তারা পরিচিতি মোহাম্মাদ আবদুল জব্বার। :

* এ শর্ট স্টোরি অব নিয়ারলি এভরিথিংস বিল ব্রাইসন। :

* মহাবিশ্বের উৎস সন্ধানে শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। :

* লাইফ অ্যান্ড ডেথ অব এ স্টার কেনেথ :আর ল্যাঙ।

*ব্রহ্মাণ্ড দেহভান্ড গুরুপ্রসাদ সেনগুপ্ত -

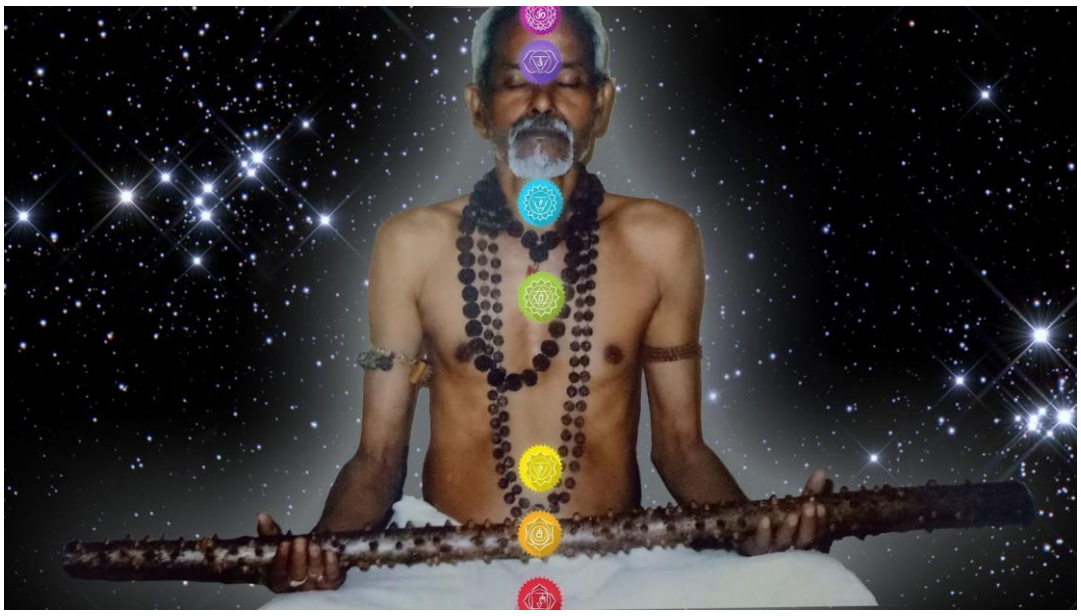

॥সমাপ্ত॥